هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

মাওলানা মওদূদী

ও

تفهيم القرآن

তাফহীমুল কোরআন

ابو الاعلى مودودى

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদী

ও

তাফহীমুল কোরআন

সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

মুনমুন পাবলিশিং হাউস

ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদী

ও

তাফহীমুল কোরআন

প্রথম প্রকাশ
শা'বান ঃ ১৪১৮
ডিসেম্বর ঃ ১৯৯৭
অগ্রহায়ণ ঃ ১৪০৪

প্রকাশক
মুনমুন পাবলিশিং হাউস
ওয়ারলেস রেল গেইট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

অক্ষর বিন্যাস
সাক্‌সেস্‌ কম্পিউটার্স

বিনিময়
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

MOULANA MOUDUDI
AND
TAFHEEMUL QURAN

HAFIZ MUNIRUDDIN AHMED

PUBLISHED BY
MUNMOON PUBLISHING HOUSE
DHAKA. BANGLADESH

www.nagorikpathagar.org

হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সাহেবের খেদমতে –

www.nagorikpathagar.org

বইটির প্রকাশনা সম্পর্কে

এই পুস্তকের সম্মানিত পাঠকরা সবাই জানেন যে, আমি গত দু'বছর থেকে বর্তমান শতকের একটি সেরা তাফসীর গ্রন্থ সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'ফী যিলালিল কোরআন' প্রকল্পের সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত আছি। আমার সাথীরা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, জানতে চেয়েছেন দু'চারজন শুভানুধ্যায়ীও। ফী যিলালিল কোরআন-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার পথ যখন এখনো অর্ধেক বাকী, তখন আমি কেন তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে লিখতে বসলাম? আমার বন্ধুদের এই কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে আমি যে কথাগুলো তাদের বলি তা আপনাদের সামনেও নিবেদন করতে চাই।

এ প্রশ্নের প্রথম জবাব হচ্ছে, যে সিঁড়ি বেয়ে মানুষ নিজের মনযিলে পৌঁছে, সে সিঁড়ির কথা সে কখনো ভুলতে পারে না। তাফহীমুল কোরআন ছিলো আমার জীবনে ফী যিলালিল কোরআনে পৌঁছার সিঁড়ি। তাফহীমুল কোরআন যদি আমাকে কোরআন বুঝার সুযোগ না করে দিতো, তাহলে কোনো দিনই আমি ফী যিলালিল কোরআনের সন্ধান পেতাম না। সেদিক থেকে আমার সবটুকু কোরআনী এলেমের জন্য আমি তাফহীমুল কোরআনের কাছে ঋণী।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, আল্লাহর কেতাবকে বোঝার জন্যে বর্তমান দুনিয়াকে যে দুটো তাফসীরের কাছে দ্বারস্থ হতে হয় তা হচ্ছে আরব-আজমের দু'জন সেরা পন্ডিত—সাইয়েদ কুতুব ও উস্তাদ আবুল আলা মওদূদী রচিত তাফহীমুল কোরআন ও ফী যিলালিল কোরআন। এদের একজন লিখেছেন মিসরের কারাগারে বসে—আরেকজন লিখেছেন পাকিস্তানের কারাগারে বসে। সময় ও দূরত্বের বিস্তার-ব্যবধান সত্ত্বেও এদুটো তাফসীর যেন একই সুরে গাথাঁ।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে আমি প্রায়ই বলি যে, বিংশ শতকের ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামী ও আরব জগতের ইখওয়ানুল মোসলেমুনকে যেমন একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না, তাফহীমুল কোরআন ও ফী যিলালিল কোরআনকেও একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এর দুটোই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের তাফসীর—একটা আরেকটার পরিপূরক। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি সাথীর এদুটো তাফসীরই পড়া উচিত। একটি জিনিস এই তাফসীর দুটো অধ্যয়নের সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, এ দুটো তাফসীরের একটাতে যা

www.nagorikpathagar.org

আছে দ্বিতীয়টিতে কিন্তু তা নেই। তাফহীমে যা আছে তা যেমন যিলালে নেই, আবার যিলালে যা আছে তাও তাফহীমে নেই। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, কিভাবে এ জিনিসটি সম্ভব হলো। শহীদ কুতুব ও উস্তাদ মওদূদী কি 'আলামে আরওয়াহ'তে বসেই এটা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা দু'জন দু'নামের দুটো তাফসীর লিখলেও বাস্তবে এর উভয়টাই হবে এক ও অভিন্ন লক্ষ্যের জন্যে নিবেদিত। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা-সংকট, কর্মনীতি-কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি যদিও এক; কিন্তু উভয়ের আলোচনার ধরন ও রেফারেন্স উভয় তাফসীরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ভিন্নতার অভিন্নতাটি সত্যিই সান্ধানী মনকে ভাবিয়ে তোলে। আপনি যখন এই উদ্দেশ্যে তাফসীর দুটো অধ্যয়ন করবেন, তখন এর অসংখ্য উদাহরণ আপনি নিজেই এর পাতায় পাতায় দেখতে পাবেন। ফী যিলালিল কোরআনে উস্তাদ মওদূদীর বই-পুস্তকের অসংখ্য রেফারেন্সও তখন আপনার দৃষ্টি এড়াবে না।

কিছু দিন আগে 'জীবন সায়াহ্নে মাওলানা মওদূদী' নামে ভিন্ন স্বাদের একটি বই আমি প্রকাশ করেছিলাম। সে তুলনায় এই বইটিতে তাফহীমুল কোরআনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশী। 'তাফহীমুল কোরআন' সম্পর্কিত এমন কিছু বিষয় এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা নিজামী ভাইয়ের কথায় 'বাংলা ভাষায় মাওলানা মরহুমের সাধনার যথার্থ মূল্যায়নে সহায়ক এমন একটি গ্রন্থ বলতে গেলে এটাই প্রথম।'

তবু যা দিতে চেয়েছি তার অনেক কিছুই হয়তো দেয়া হয়নি। আসলে মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কোরআন সম্পকির্ত সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখা মাল-মসল্লার পরিমাণ বেশী হয়ে যাওয়ায় বাছাই করতেও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরাদা আছে, যা রয়ে গেছে তার সাথে আরো কিছু যোগ করে পরবর্তী কোনো সময় আবার কিছু পেশ করার। পরিকল্পনা তো আমরা মানুষরা করি কিন্তু তার কোন্‌টা বাস্তবায়িত হবে কিংবা তার কোন্‌টা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত, সে ফয়সালা তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করে। বইটির অনুবাদ কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন সুহৃদ বন্ধু মাওলানা হাসান রহমতী ও এবিএম কামালউদ্দিন শামীম। এদের উভয়েরই অনুবাদ সাহিত্যে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি এদের উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

www.nagorikpathagar.org

শেষ করার আগে আরেকটি কথা মনে হয় বলে নেয়া দরকার। এই পুস্তকে যেসব লেখা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তার মধ্যে আমার নিজের লেখাটা বাদে সব কয়টি লেখাই আজ থেকে ২৫ বছর আগের লেখা। পড়ার সময় কোনো তথ্য কিংবা তত্ত্বকে পুরনো মনে হতে পারে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই কোনো লেখাকে বর্তমান তথ্যের আলোকে সম্পাদনা করিনি। তেমনটি করলে লেখাগুলো মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলতো। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের যে লেখাটি এখানে আছে, তাও ২৫ বছর আগের। লাহোরের সাপ্তাহিক 'আইন' পত্রিকায় উর্দু ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়েছিলো। আমি এ বিষয়ের ওপর তাঁর কাছ থেকে নতুনভাবে একটি বাংলা লেখা না চেয়ে সেই লেখাটার পুনরায় বাংলা তরজমা পেশ করলাম। উদ্দেশ্য, পাঠকদের সিকি শতক আগের একটি পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। আমার কাছে মনে হয়েছে একমাত্র এ উপায়েই তাফহীমুল কোরআনের সমাপ্তিলগনের সেই ঐতিহাসিক ও আবেগময় পরিবেশকে আমরা আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারবো।

মাওলানার কর্মময় জীবন সম্পর্কে এই পুস্তকের দু'একটা প্রবন্ধের নাম দেখে কারো কাছে 'জীবন সায়াহ্নে মাওলানা মওদূদী বইটির পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে, তাদের জন্যে বলছি। নামের ক্ষেত্রে কিছু মিল থাকলেও এই বইতে পরিবেশিত অধিকাংশ তথ্যই নতুন।

ইসলামী আন্দোলনে আমার একান্ত সাথী ও বড়ো ভাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল তাফহীমুল কোরআনের এক নিবেদিত খাদেম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাইকে যখন আমি গত মাসে লন্ডন থেকে ঢাকায় এসে এই বইটির পরিকল্পনার কথা জানালাম, তখন তিনি তার বহুবিধ ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় বের করে এর জন্যে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আমি তার শোকরিয়া আদায় করি।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা কোরআনের পাঠকদের এই ছোট্ট খেদমত দ্বারা উপকৃত করুন—এই আমার কামনা।

ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

মুনির উদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর অভিমত

এযুগের বিভ্রান্ত মানব গোষ্ঠীর জন্যে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজের জন্য তাফহীমুল কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দানের ব্যাপারে এবং পাশ্চাত্যের প্রচারণায় বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তরে কোরআনী হেদায়াতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা মাওলানা মওদূদী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হের সিনাকে বিশেষভাবে রওশন করেছিলেন। তাফহীমুল কোরআন তারই জীবন্ত সাক্ষী।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) সার্থক 'দায়ী ইলাল্লাহ্' হিসাবে তাঁর সংগ্রামী জীবনে বিশ্ববাসীর জন্যে যুব সমাজের জন্যে অসংখ্য অবদান রেখেছেন। নিসন্দেহে তাফহীমুল কোরআন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু করে ১৯৭২-এর জুন মাসে এসে মাওলানা মরহুমের যিন্দেগীর এই শেষ সাধনার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। সাধক মওদূদীর নিজের ভাষণ, এ সাধনার পটভূমি শুরু এবং শেষের ইতিহাস, তাঁর নিজের ভাষায় এর মূল্যায়ন, এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান দলীলসমূহ, তাফহীমুল কোরআন থেকে উপকৃত বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মূল্যায়ন সহ একটি অনন্য তথ্যসমৃদ্ধ বই 'মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কোরআন' লেখা, সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের একান্ত প্রিয় ভাই হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ এটা জেনে মনটা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে। বাংলা ভাষায় মাওলানা মরহুমের সাধনার যথার্থ মূল্যায়নের সহায়ক এমন একটি গ্রন্থ বলতে গেলে এটাই প্রথম।

আমি দৃঢ় আস্থার সাথে আশা পোষণ করি, বইখানা জ্ঞান-পিপাসু মনের যেমন খোরাক যোগাবে, তেমনি তাফহীমুল কোরআনের যথাযথ মূল্যায়নেও পাঠকদের সহায়ক হবে।

লেখক হাফেজ মুনির ছাত্র জীবন থেকে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসাবে গড়ে উঠা দ্বীনের একজন খাদেম। তার এই খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহর বান্দাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করুন মনে-প্রাণে এটাই কামনা করি।

মতিউর রহমান নিজামী

www.nagorikpathagar.org

কোথায় কি আছে

মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কোরআন ও কিছু সমকালীন চিন্তা	হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ	৯
মাওলানাকে দেখেছি একান্ত কাছে থেকে	মালিক গোলাম আলী	১৫
মাওলানা মওদূদীর নিত্য দিনের ডাইরী	সফদর আলী চৌধুরী	২১
মাওলানা মওদূদীর অসামান্য লেখনী প্রতিভা	আখলাক হোসেন	২৮
মাওলানা মওদূদীঃ একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ	আবু সলিম আবুল হাই	৩১
ফাঁসীর কক্ষে তাকে দেখেছি নির্ভীক	মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ	৩৭
তাফহীমুল কোরআন ঃ শুরুর আগে ও শেষের পরে	নঈম সিদ্দীকী	৪২
তাফহীমুল কোরআন একটি বড় নেয়ামত	খাদিজা আখতার রেজায়ী	৫০
আমার প্রিয় গ্রন্থ 'আল কোরআন'	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	৫৯
তাফহীমুল কোরআন ঃ সূচনা ও সমাপ্তি লগ্নে	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	৬১
কোন্ যুগ সন্ধিক্ষণে আমি তাফহীমুল কোরআন লিখতে শুরু করি	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	৬৪
তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে আমার নিজস্ব বক্তব্য	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	৭০
তাফহীমুল কোরআনের প্রকাশনা কিভাবে শুরু হলো	সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	৭৫
একটি মহান তাফসীর ও একজন মহা মোফাসসের	মুফতী সাইয়েদ সাইয়াহ্ উদ্দীন	৮২
তাফহীমুল কোরআনের ঢেউ - লাহোর থেকে নায়রোবী	আবদুর রহমান বযমী	৮৮
আপনি কেন তাফহীমুল কোরআন পড়বেন	অধ্যাপক গোলাম আযম	৯২

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কোরআন ও কিছু সমকালীন চিন্তা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

> *নবী ইউসুফের স্মৃতি-বিজড়িত মিসরের কারাগার আর ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের কারাগার থেকে দু'জন মনীষী সাইয়েদ কুতুব ও উস্তাদ মওদূদী এক এবং অভিন্ন সুরে ডেকে বলছেন, 'হে আমার জেলের সাথী, পৃথিবী পরিচালনায় অসংখ্য মালিকের গোলামী করা ভালো, না একজন পরাক্রমশালী মালিকের গোলামী করা ভালো!'*

৪২ থেকে ৭২, মাত্র তিরিশটি বছর ॥

গোটা মানব জাতির ইতিহাসে অবশ্যই এ সময়টুকু নিতান্ত সামান্য—ইতিহাসের কয়েকটি 'ক্ষণ' মাত্র। কিন্তু একটি জাতির ক্ষেত্রে তা মোটেই সামান্য কিছু 'ক্ষণ' নয়—বিশেষ করে আজকের নিত্য নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের যুগে যেখানে মানুষ আলোর গতিতে মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সফরের কর্মসূচী তৈরী করছে—সেখানে তিরিশটি বছর নিসন্দেহে অনেক কয়টি মাস, অনেক কয়টি দিন, অনেক ও অসংখ্য ঘন্টার সমষ্টি বটে! শতকের এই তিরিশটি বছরে মানব জাতি যেমনি অনেক ধ্বংস দেখেছে, তেমনি দেখেছে কিছু উৎকর্ষও।

❑ ১৯৪২ সাল। গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবলীলা। বন্দুক ট্যাঙ্ক সাবমেরিন জেট ফাইটার—সব কিছুর লক্ষ্য একটাই এবং তা হচ্ছে মানুষ নিধন, প্রতিযোগিতা চলছে মানুষ মারার। জনপদসমূহ জ্বলছে আগুনের দাবদাহে, শহরসমূহ জ্বলছে বোমার বিস্ফোরণে। মানুষ মারার এ আদিম খেলার

www.nagorikpathagar.org

শিকার গোটা দুনিয়া। পৃথিবীর তিনটি মহাদেশই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। মানব জাতির জন্যে প্রতিটি সকাল আসে একটি নতুন ধ্বংসের বার্তা নিয়ে, প্রতিটি সন্ধ্যা আসে একটি নতুন মৃত্যুর সংকেত নিয়ে। গোটা বিশ্ব যখন এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত, তখন মানুষ জাতিকে এই মহা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে এক-দু'জন সাহসী মানুষ কিছু মহান কাজের সূচনাও করেছেন।

❑ তাফহীমুল কোরআন-এর যাত্রা শুরু হলো। ঘোষণা এলো—'মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিতে হবে।'

❑ ৪৩-৪৪ সাল ধরে যখন মানুষ তার নিজের হাতের গড়া সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যস্ত, তখন তাফহীমের প্রণেতা এই মহান গ্রন্থের পাশাপাশি আগামী বিপ্লবের এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে একটি জামায়াতের ভিত্তিও রচনা করেন। কারণ বিপ্লবের কোনো সুদক্ষ কর্মী বাহিনী ছাড়া বিপ্লবের ঘোষণা বাস্তবায়ন করবে কে?

❑ ১৯৪৫ সালের দিকে এসে মানুষ নিধনের এ খেলা বন্ধ হলো—বিজয়ীর আদালতে বিজিতকে হাযির করা হলো যুদ্ধবন্দী হিসেবে। একজন বিচারক আরেকজন আসামী। অথচ মানবতার কাঠগড়ায় মানুষ মারার অপরাধে সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংসের অপরাধে এরা উভয়ই হচ্ছে আসামী। কিন্তু দুনিয়ার আদালতে তো চিরকাল যে বিজিত তারই বিচার হয়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস! এক অপরাধী আজ বিচারকের আসনে, আরেক অপরাধী আসামীর শেকল পরা।

পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহ যখন এই মহা ধ্বংসের খেলায় মত্ত, তখন এক আল্লাহর বান্দা তাফহীমুল কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষদের ডেকে ডেকে বলছেন—'হে মানুষ তোমরা সবাই গোলামী করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। এ ভাবেই আশা করা যায় তোমরা মহা বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।' (সূরায়ে বাকারা আয়াত ২১)

❑ ১৯৪৭ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে তিনটি নতুন দেশের নকশা অংকিত হলো। প্রথমত, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্জিত হলো পাকিস্তান। দ্বিতীয়ত,

www.nagorikpathagar.org

বৃহত্তর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে এলো ভারত নামের একটি বিশাল ভূখন্ড। তৃতীয়ত, মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল ইসরাইলকে বসানো হলো মুসলমানদের পবিত্র ভূমি—ফিলিস্তিনে। ষড়যন্ত্র শুরু হলো আরবে-আজমে—একই সাথে একই কায়দায়।

উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ বেনিয়া ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্র যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলো, তখন ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতারাও আরব ভূখন্ডে এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলো। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই মার্কিনীরা আরব জগতের ইসলামী আন্দোলন—'ইখওয়ানুল মোসলেমুন'কে বে-আইনী ঘোষণা করালো। ইসরাইলের ভবিষ্যতকে নিষ্কন্টক করার জন্যে ৪৯ সালে এ শতকের মহান নেতাকে তারা নির্মমভাবে তাদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করলো।

❑ উপমহাদেশের মুসলমানদের ইংরেজ ও হিন্দুদের কালো থাবা থেকে বাঁচানোর জন্যে মাওলানা মওদূদী যখন জামায়াতে ইসলামী ও তাফহীমুল কোরআনের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে রত, তখন অগণিত আল্লাহর নবীর স্মৃতি বিজড়িত মিসরের অমর মোজাহেদ সাইয়েদ কুতুব কারার নিকষ আঁধারে বসে পৃথিবীর মানুষগুলোকে ইহুদী জাতিসহ সব জাহেলিয়াতের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্যে লিখতে শুরু করলেন একটি কালজয়ী গ্রন্থ তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'। লৌহ প্রাচীরের পেছনে ফেরাউনের প্রেতাত্মারা যখন তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছিলো, তখন তিনি রচনা করছিলেন আগামী বিপ্লবের ইশতেহার 'কোরআনের ছায়াতলে'। সে ইশতেহারে মানব জাতিকে ডেকে তিনি বললেন—'কোরআনে করীম অধ্যয়নের সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমি মর্তলোক থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছি। আর এর ওপর থেকে আমি নীচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখছি, জাহেলিয়াত যেন এক প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে গোটা মানব জাতির ওপর ছেয়ে আছে।'

নবী ইউসুফের স্মৃতি-বিজড়িত মিসরের কারাগার আর ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের কারাগার থেকে দু'জন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী সাইয়েদ কুতুব ও উস্তাদ মওদূদী এক এবং অভিন্ন সুরে ডেকে বলছেন, 'হে আমার জেলের সাথী,

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবী পরিচালনায় অসংখ্য মালিকের গোলামী করা ভালো, না একজন পরাক্রমশালী মালিকের গোলামী করা ভালো!' (সূরায়ে ইউসুফ আয়াত ৩৯)

❑ ৫০ সালে সাইয়েদ মওদূদীর জন্যে যখন পাকিস্তানী জেলের দরজা খুললো, তখন সাইয়েদ কুতুবের জন্যে মিসরে জেলের দরজা বন্ধ হলো। সেখানে চলছিলো আরেকটি বড়ো ধরনের চক্রান্ত। মাত্র এক বছর আগে তাগূতের আধুনিক অনুসারীরা আরব জাহানের ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রদূত হাসান আল বান্নাকে গুলী করে হত্যা করলো। তাঁর এক একজন সাথী কঠোর নির্যাতনের ফলে যখন পরিণত হয়েছেন খাঁটি সোনায়, তখন সেই সোনার মানুষদের অগ্রসেনানী হিসেবে এগিয়ে এলেন বিপ্লবের সিপাহসালার কোরআন হাদীসের মহান পন্ডিত সাইয়েদ কুতুব। চারিদিকে শকুনরা যেন নতুন রক্তের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বিশ্ব-জোড়া নব্য জাহেলিয়াতের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য যেন এক ও অভিন্ন, পাকিস্তানের উস্তাদ মওদূদী ও মিসরের সাইয়েদ কুতুব।

❑ ৫৩ সালে উস্তাদ মওদূদীকে ফাঁসির দন্ডাদেশ শোনানো হলো। শয়তানের প্রেতাত্মারা ভেবেছিলো দ্বীনের এই প্রদীপ্ত শিখাকে বুঝি এমনি নির্বাপিত করে দেয়া যাবে। 'আল কুফরো মিল্লাতুন ওয়াহেদার' সূত্র ধরে ওদিকে ৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকেও গ্রেফতার করে কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে দেয়া হলো। মাওলানা মওদূদী যখন কারার অন্ধকারে একটি নিবু নিবু বাতির সামনে বসে বাইরের বিশাল দুনিয়ার আলো জ্বালাবার জন্যে তাফহীমুল কোরআন রচনায় নিমগ্ন থাকলেন, তখন সাইয়েদ কুতুবও তাঁর জীবনের নিবু নিবু সলতেটিকে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর আলো দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন। ৫৫ সালের যে সময়টিতে পাকিস্তানী কারাগার থেকে উস্তাদ মওদূদী মুক্তি পেলেন, তখন মিসরীয় কারাগারে সাইয়েদ কুতুবের বিচারের নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছিলো। সে নাটকের যারা রাজা-উযীর, তারা আল্লাহর দ্বীনের একজন মহান নেতাকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলো।

সাইয়েদ কুতুবের বিপ্লবের ইশতেহার 'ফী যিলালিল কোরআন' রচনার কাজ যখন শেষ, উস্তাদ মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআনের' পথ চলা তখনো অনেক

www.nagorikpathagar.org

ব্যাকী। এ যেন অনাগত বংশধরদের জন্যে সাইয়েদ কুতুবের কোরআনের ছায়াতলে *(ফী যিলালিল কোরআন)* বসে উস্তাদ মওদূদীর কোরআন বুঝানোর *(তাফহীমুল কোরআন)* এক অভিন্ন মালায় সুতো গেঁথে যাওয়া।

❑ ৬৫ সালে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে রামরাজ্যের কল্পনা-বিলাসীরা একটি মুসলিম দেশের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার আমরণ যুদ্ধে যখন মেতে উঠেছে, তখন ইহুদী ও মার্কিনী তাবেদারদের ওখানে শুরু হয়েছে সাইয়েদ কুতুবকে চিরতরে খতম করে দেয়া নাটকটির ঘৃণ্য রিহার্সাল। ৬৬ সালের মাঝামাঝি যখন এই নাটক সত্যিই একদিন মঞ্চস্থ হলো, তখন সাইয়েদ কুতুবের পুণ্য নামের সাথে আল্লাহ-প্রদত্ত আরেকটি খেতাব এসে জুড়লো। শহীদী কাফেলায় শামিল হলেন আরেকজন ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা। তাগূতের পোষা শিকারী জন্তুর রক্তের আদিম নেশা মিসরে মিটলেও পাকিস্তানে সম্ভবত তা মিটতে আরো কিছু সময় বাকী।

❑ ৬৭ সালে উস্তাদ মওদূদী পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু এবার জেলে এসে তিনি দেখলেন তাঁর সেই 'সাহেবায়েস ছেজন'—কারার সাথী সাইয়েদ কুতুব আর নেই। ততোক্ষণে জান্নাতী গালিচায় তাঁর মহা সম্বর্ধনা শুরু হয়ে গেছে। তাফহীমুল কোরআন প্রণেতার কাছে নিজেকে বড়ো একা মনে হলো। শহীদ কুতুবকে তিনি 'ফামিনহুম মান কাযা নাহবাহু'-এর দলে *(তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ যারা তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে)* শামিল করে নিজেকে রাখলেন 'ওয়া মিনহুম মাইয়্যানতাযের' *(এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা গন্তব্য স্থলে যাবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে)*-এর কাতারে। অপেক্ষার মুহূর্তগুলোতে তিনি পুনরায় নিমগ্ন হলেন তাফহীমুল কোরআন-এর কাগজ-কলমে।

❑ ৬৮ থেকে ৭০। তাফহীমুল কোরআন প্রণেতা শারীরিক দিক থেকে দারুণভাবে ভেংগে পড়েছেন। প্রচুর পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পথ যেন এগোয় না। আল্লাহর দরবারে তাঁর এই অনুগত বান্দা হাত তুলে বলছেন, 'হে আল্লাহ! ৪২ সালে যখন সারা বিশ্ব একে অপরকে ধ্বংস করার কাজে মত্ত হয়ে পড়েছিলো, তখন আমি 'গড়ার' এই ক্ষুদ্র কাজ—'তাফহীমুল

www.nagorikpathagar.org

কোরআন' লিখতে শুরু করেছিলাম। হে আল্লাহ! আমার 'গড়ার' সে নক্শা বানানো যে এখনো শেষ হয়নি। তুমি আমাকে শক্তি দাও—সাহস দাও, আগামী প্রজন্মের কারিগরদের হাতে এই 'নক্শা' যেন আমি পৌঁছে দিতে পারি, সে তাওফীক তুমি আমাকে দাও। আরশের মালিক এই বান্দার মোনাজাত শুনলেন। উস্তাদ মওদূদী সুস্থ হয়ে পুনরায় তাফহীমুল কোরআন লিখতে বসলেন।

❒ ইতিমধ্যে এখানকার মুসলমানদের জীবনে শতাব্দীর প্রলয়ংকরী দুর্যোগ নেমে এলো। গড়ার বদলে তারা ভাংগনের তান্ডব দেখলো। ঐক্যের বদলে অনৈক্যের বীভৎসতা দেখলো। শান্তির কপোতের ঝাঁকে তারা দেখলো যুদ্ধের শকুনীদের নির্মম থাবা। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের সামনে নিরুপায় হয়ে কোটি কোটি আল্লাহর বান্দাহর সাথে তাফহীমুল কোরআনের প্রণেতাও মালিকের দরবারে চোখের পানি ফেললেন।

❒ ১৯৭২ সালের ৭ই জুনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যাটি এলো—আল্লাহর এক নিবেদিত বান্দা তিরিশ বছর ধরে যে মহান কেতাব রচনা করছিলেন—যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর—তাফহীমুল কোরআন সমাপ্ত হলো *(৬ষ্ঠ শেষ খন্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ৭২ সালের অক্টোবর মাসে)* মুসলিম সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী লাহোর শহরে তাফহীমুল কোরআনের সমাপনী অনুষ্ঠানে *(২২শে জুন ৭২)* দাঁড়িয়ে মালিকের দরবারে একান্ত বিনয়ের সাথে নিজের খেদমতটুকু হাযির করে বলছেন, 'আমার জীবনের তিরিশ বছরের এই দীর্ঘ সময়টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমার এই পরিশ্রম ছিলো সত্য দ্বীনের জন্যে, এই তাফসীর ছিলো সত্য দ্বীনকে বুঝানোর জন্যে আর আমার এই ক্ষুদ্র জীবন সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করা ছাড়া আর কোনো কাজেই নিবেদিত ছিলো না। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহদের একজনকে তাওফীক দান করেছেন ঠিক যেমনটি তিনি দান করেছেন আমার মতো একজন নগণ্য বান্দাকে। আল্লাহ তুমি একে কবুল করে নিয়ো এবং হাশরের প্রান্তরে একে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিয়ো। আমীন !

www.nagorikpathagar.org

মাওলানাকে দেখেছি একান্ত কাছে থেকে

মালিক গোলাম আলী

মাওলানা মওদূদী জায়গা জমি, কোন মূলধন এমনকি নিজস্ব বাড়ীরও মালিক ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর পরিবার একটি ভাড়া করা বাড়ীতে থাকতেন। নিজের আয়ের বেশীর ভাগ আল্লাহর পথে দান করাও কোন ছোট ব্যাপার নয়। এ ধরনের আত্মত্যাগ ও কোরবানীর ঘটনা কালে ভদ্রেই খুঁজে পাওয়া যায়।

মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার পরিচয় এবং নৈকট্য ত্রিশ-বত্রিশ বছরের। কিন্তু মাওলানার এবং আমার নিজের মেযাজ-মর্জি এমন যে, পরস্পরের ব্যক্তিগত বিষয়ে জানা-শোনার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সুবিন্যস্ত এবং বিস্তারিত না জানার কারণও ছিলো। আমার মনে এ বিষয়ে জানার কৌতূহল বা আগ্রহ জাগেনি। কেননা, মাওলানা মওদূদীর সমগ্র জীবনই একটা খোলা বইয়ের মতো। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খুঁটিনাটি না জেনেও একটি অংশকে জানাই যথেষ্ট। এতেই সবকিছু স্পষ্ট বোঝা যায়। খন্ডিত সেই অংশকে সামনে রেখেই মাওলানার সমগ্র জীবন সম্পর্কে সহজে ধারণা করা যায়।

ব্যক্তি জীবন ছাড়া মাওলানা মওদূদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। খুব কাছ থেকে মাওলানাকে আমি দেখেছি। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে একজন মহান ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখার সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানের অন্তরঙ্গ সময়ে যতটুকু চেনা যায়, যতটুকু জানা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অল্প কথায় প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এটা মোটেই সহজ কাজ নয়।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন হিজরী ১৩২১ সালে ঈসায়ী ১৯০৩ সালে। দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষেরা হিরাতের চিশত নামক স্থানে বসবাস করতেন। সেই পরিবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরীর পূর্ব-পুরুষ ছিলেন। মাওলানা মওদূদীর পরিবার খাজা মওদূদের নামে পরিচিতি লাভ করে। সেই বংশের যে শাখার সাথে মাওলানা মওদূদী সম্পৃক্ত, সেই শাখার পিতামহ হযরত আবুল আলা মওদূদী সিকান্দার লোদীর সময়ে হিজরত করে ভারতে আসেন। তাঁর বংশধরগণ দিল্লীতে বসতি স্থাপন করে। মাওলানা মওদূদীর নাম তাঁর সেই পিতামহের নামানুসারে রাখা হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথেও মাওলানা মওদূদীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। একারণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মাওলানার পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসানকে আলীগড় কলেজে ভর্তি করে নেন। পরে তিনি আইন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবন শেষে দীর্ঘদিন তিনি আইন ব্যবসা চালিয়ে যান। আইন ব্যবসা সূত্রে তিনি আওরঙ্গাবাদে গমন করেন। মাওলানা মওদূদীর পিতা পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশে জীবন যাপন করার পাশাপাশি আওরঙ্গাবাদে একজন খোদাভীরু ওলীর সাহচর্য পেয়েছিলেন। ফলে তিনি আইন ব্যবসায় খুবই সতর্ক হয়ে ওঠেন। মিথ্যা এবং সন্দেহমূলক মামলা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। মাওলানা মওদূদী তাঁর ধর্মপ্রাণ পিতা সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি মক্কেলের সাথে বিবাদী পক্ষের উকিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের মতো জেরা করতেন। মক্কেলকে সৎ মযলুম মনে হলে তারপর তার মামলা গ্রহণ করতেন। এরকম যাচাই-বাছাই করে মামলা গ্রহণ করা হলে আইন ব্যবসায় উন্নতির আশা করা যায় না। মাওলানা মওদূদীর পিতা পরবর্তী সময়ে আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। ইতিমধ্যে তিনি দ্বীনদারী এবং পরহেযগারীতে এক বিরল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

সেই সময়ে মাওলানা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাওলানাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তার পিতা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মাওলানা মওদূদী একবার বলেছিলেন, বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমার পিতা আমার জন্য অর্থ-সম্পদ রেখে যাননি ঠিকই, কিন্তু তিনি আমার জন্য রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক প্রশিক্ষণের উত্তরাধিকার।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদীর পিতা নিজের প্রিয় সন্তানকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সাহচর্য প্রদান করেন। এ সময়ে তাকে কোন মক্তব বা মাদ্রাসায় পাঠানো হয়নি। গৃহ-শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল। গৃহ-শিক্ষক মাওলানাকে আরবী সাহিত্য এবং ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকের কাছে পড়াশোনার সময়টুকু বাদে অন্য সময়ে মাওলানার পিতা সন্তানকে কাছে কাছে রাখতেন। মাওলানার সাহচর্যে এসে তাঁর ধীরস্থিরভাবে কথা বলার ভঙ্গি আমাকে ভীষণ চমৎকৃত করেছিল। কারণ তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, সেসব কথা যে কেউ শোনার সাথে সাথে লিখে ফেলতে পারতো। একদিন কৌতূহলী হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মাওলানা জানান, আমার পিতা আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখতেন। সমবয়সী ছেলেদের সাথে মেলা-মেশার সুযোগ আমার হয়নি। ফলে কখনো আমার মুখে একটি অশ্লীল শব্দও উচ্চারিত হয়নি। আমার পিতা তাঁর সঙ্গে করে আমাকে যাদের কাছে নিয়ে যেতেন, তারা সবাই ছিলেন বয়স্ক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা সবাই ধীর-শান্তভাবে গম্ভীর হয়ে কথা বলতেন। দিনের পর দিন সেই পরিবেশে মেলামেশার ফলে ধীর-শান্তভাবে কথা বলার ভঙ্গি আমার স্বভাবের অংশে পরিণত হয়।

মাওলানা মওদূদীর তেরো বছর বয়সে তাঁর পিতা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। চার বছর শয্যাশায়ী থেকে ১৯২০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মওদূদীর যথার্থ কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। মাওলানার পরিচয় রেকর্ড হিসাবে তরজুমানুল কোরআনের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। আমার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার প্রমাণ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই লেখায় দীর্ঘ একুশ বছরের বিবরণ উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিকে না গিয়ে আমি মাওলানা মওদূদীর সংস্পর্শে থাকাকালীন সময়ের কিছু অভিজ্ঞতার প্রতি আলোকপাত করবো।

মাওলানা মওদূদীর সাথে অবস্থানকালে সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি তাঁর সম্পর্কে আমার মনে দাগ কেটেছে সেটি হচ্ছে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সহিষ্ণু স্বভাবের রাশভারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর চেয়ে ঠান্ডা স্বভাবের মনোমুগ্ধকর মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি। উত্তেজিত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও তাঁকে আমি দেখেছি তিনি অসম্ভব রকমের ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন। বিরক্তির কোন ছাপ চিহ্ন আমি কখনো তার চেহারায় দেখিনি। মনে মনে বিরক্ত হলেও চেহারায়

www.nagorikpathagar.org

তার প্রকাশ ছিল না। মুখের কথায়ও সেটা বোঝা যেতো না। কথাবার্তা বলার সময়ে এবং বক্তৃতা করার সময়ে ধীরস্থির গম্ভীর একটা ভাব তিনি বজায় রাখতেন।

মাওলানা মওদূদী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং আমীর। জেলখানায় থাকাকালীন সময় বাদে তিনিই দলের প্রধান ছিলেন। কিন্তু আমি কখনো দেখিনি যে, তিনি দলের কোন সদস্যের ওপর কোন কাজের দায়িত্ব দিতে গিয়ে আমীরসুলভ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বন্ধুসুলভ ও ভ্রাতৃসুলভ সহমর্মিতার মাধ্যমে দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাতেন। দলের প্রত্যেক সদস্য মাওলানা মওদূদীর পরামর্শকেই আদেশ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। অনেক সময় আমার মনে হতো যে, বাইরে থেকে যারা মাওলানা মওদূদীকে কঠোর স্বভাবের মানুষ মনে করেন, তাঁর বিরোধিতা করেন, তারা যদি তাঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকার সুযোগ পেতেন, তাহলে তাদের ভুল শুধরে যেতো। তারা তাঁকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতেন।

ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ছাড়া মাওলানা মওদূদীর যে গুণবৈশিষ্ট আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে তাঁর ঔদার্য এবং ক্ষমাসুলভ মনোভাব। তবে কোন ব্যক্তি বা গ্রুপকে যদি তিনি আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী মনে করতেন তাদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব হতো কঠোর। সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোসহীন। তাদের সাথে তিনি সর্বশক্তিতে মোকাবেলা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে সত্যের শত্রুদের দ্বীনের দুশমনদের সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন নীতিপরায়ণতার প্রতীক। কোন ব্যক্তি মাওলানাকে কষ্ট দিয়ে তাঁর বিরক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হতো না। মাওলানা অসাধারণ ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সাথে সে কষ্ট সহ্য করতেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে শত্রুও অবশেষে বন্ধু হয়ে যেতো। একই ব্যক্তি বারবার তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি রাগ করতেন না। বিরক্ত হতেন না। বরং বিষয়টা ভুলে থাকার ও উপেক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

মাওলানা মওদূদীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের একটি বড় দিক হচ্ছে আল্লাহর পথে আর্থিক সাহায্য তথা আর্থিক আত্মত্যাগ। মাওলানা মওদূদী ৬০টির বেশী মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাক–ভারত উপমহাদেশে এতো বেশী সংখ্যক গ্রন্থ-রচয়িতা অল্পই আছেন। তিনি যদি এসব গ্রন্থ বিক্রির অর্থ নিজে গ্রহণ করতেন, তবে নিঃসন্দেহে কোটি কোটি টাকার মালিক হতেন। কিন্তু চার-পাঁচটি গ্রন্থই মাসিক তরজুমানুল কোরআন এবং তাফহীমুল কোরআনের স্বত্ব

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া অন্য সব গ্রন্থ তিনি জামায়াতে ইসলামীকে দান করেছেন। এসব গ্রন্থের বিক্রিলব্ধ টাকা জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার আগেও তিনি আলাদা করে রাখতেন। আমানত হিসাবে তিনি এসব টাকা নিজের কাছে রাখতেন। জামায়াতে ইসলামী একটি দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর সঞ্চিত সমুদয় অর্থ এবং উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর গ্রন্থস্বত্ব তিনি জামায়াতকে দান করেন। পরবর্তী সময়ে এসব গ্রন্থের বিক্রি করা অর্থে জামায়াত তার দ্বীনী কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মাওলানা মওদূদী জায়গা-জমি, কোন মূলধন এমনকি নিজস্ব বাড়ীরও মালিক ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর পরিবার একটি ভাড়া করা বাড়ীতে থাকতেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে আল্লাহর পথে মোটা অংকের এককালীন দান করার গুরুত্ব অসামান্য। কিন্তু নিজের যাবতীয় স্থায়ী আয়ের বেশীর ভাগ আল্লাহর পথে দান করাও কোন ছোট ব্যাপার নয়। এ ধরনের আত্মত্যাগ ও কোরবানীর ঘটনা কালে ভদ্রেই খুঁজে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার ছাড়াও মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণের মতো কঠিন অবিচল সিদ্ধান্তের ঘটনা তার প্রমাণ। বিশ্ববাসীর সামনে এ ঘটনা সুস্পষ্ট। মৃত্যুদন্ডের আদেশ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সবার জানা। এখানে সেসব উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মাওলানা মওদূদীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের এবং ঈমানী দৃঢ়তার পরীক্ষা ফাঁসীর আদেশের ঘটনার আগেও হয়ে গেছে। ভারত বিভক্তির সময়ে পূর্ব পাঞ্জাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীও সবার জানা।

মাওলানা মওদূদীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে, প্রথমবার কোন মানুষ তাঁর সাথে পরিচিত হতে এলে তিনি কোন প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না। আমি যখন প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছিলাম, সেই সময় এটা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কিছুকাল মাওলানার সান্নিধ্যে অবস্থানের পর আমি লক্ষ্য করেছি তিনি বাইরের দৃশ্যমান মানুষের চেয়ে অন্তর্গতভাবে অনেক বেশী সংবেদনশীল মানুষ। বাইরে থেকে নিরাসক্ত এবং হৃদয়হীন মনে হলেও মনের ভেতর তাঁর বিরাজ করতো আবেগ-উচ্ছ্বাসময় ভ্রাতৃত্ববোধের এক ঝর্ণাধারা। চিন্তা-গবেষণার মধ্যে সবসময় ব্যস্ত থাকা বহুমুখী কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে মাওলানা মওদূদীর ব্যবহার, কথাবার্তায় মিশুক স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেতো না। কিন্তু কয়েকবার মেলা-মেশার মধ্যেই প্রকাশ পেতো যে, তাঁর ব্যবহার অসাধারণ মাধুর্যপূর্ণ এবং তাঁর অন্তর সুকুমারবৃত্তিতে ভরা।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমরা লাহোর পৌঁছুলাম। সে সময় কেন্দ্রীয় নেতাদের সকলের বসবাসের ব্যবস্থা হয়নি। ফলে কয়েকটি তাঁবু ভাড়া নিয়ে খোলা মাঠে সেগুলো স্থাপন করে বসবাসের সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়। মাওলানা মওদূদীকে যারা চিনতেন এবং জামায়াতে ইসলামীকে যারা ভালোবাসতেন, তারা এ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। মাওলানাকে তাঁর পরিবার-পরিজনসহ অন্যত্র যাওয়ার জন্য তারা পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। আমরাও সেটা চাচ্ছিলাম। মাওলানার কষ্ট দেখে আমরাও কষ্ট পাচ্ছিলাম। শীত এবং বর্ষার মওসুম ছিল নিকটে। এ ধরনের যাযাবরসুলভ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের কারো ছিল না। ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে ছিল। পর্দার ব্যবস্থাও পর্যাপ্তভাবে করা যাচ্ছিল না। তাঁবুর ভেতরে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। মাওলানা মওদূদী সঙ্গী-সাথীদের খোলা মাঠে তাঁবুর মধ্যে রেখে নিজে অন্যত্র পাকা ভবনে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি হিতাকাংখীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, আমি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবো আর আমার সঙ্গী-সাথীরা কষ্ট করবে এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা যান। পরে আমরা সবাই সেই তাঁবুতেই পুরো বর্ষাকাল কাটিয়ে দিলাম। ওপর থেকে বৃষ্টির পানি পড়তো আর নীচে থেকেও পানি তাঁবুর ভেতর গড়িয়ে আসতো। পরে ইচ্ছারায় কয়েকটি ঘর পাশাপাশি খালি পাওয়া গেলো। যাযাবর জীবন ছেড়ে আমরা সবাই সেই সব ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদীর নিত্য দিনের ডাইরী

সফদর আলী চৌধুরী

> *মাওলানা মওদূদীর জীবনে কোন গোপনীয়তা নেই, কোন অস্পষ্টতা নেই। তাঁর জীবন হচ্ছে একটি খোলা বইয়ের মতো। সেই বইয়ের প্রতিটি পাতায় রয়েছে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর। জীবনের প্রতিটি দিন তিনি মর্দে মোজাহেদদের মতোই কাটিয়েছেন, তাঁর সমগ্র জীবন এক অনুসরণযোগ্য আদর্শ।*

মাওলানা মওদূদী গভীর রাতে ঘুমুতেন। কিন্তু খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করতেন। বহুবার তিনি এশা থেকে ফজর পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছেন। এ সময়ে সার-রাত পড়ার টেবিলে কাটিয়েছেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা এমনি অসাধারণ পরিশ্রমের মাধ্যমেই তৈরী হয়েছিল।

রাত দেড়টায় কাজ শেষ করে সাংবাদিকরা যখন ঘরে ফিরতেন ঠিক সেই সময়েই মাওলানা মওদূদী ঘরের আলো নেভাতেন। এতে বোঝা যেতো যে, মাওলানা সেই সময়েই পড়ার টেবিল থেকে উঠেছেন।

মাওলানা মওদূদীর ঘুমও ছিল বিস্ময়কর। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতাও ছিল ভয়াবহ। সেই সময়ে দেড় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন রাতে কারফিউ বলবৎ ছিল। ব্যাপকভাবে ধরপাকড় চলছিল। কারফিউ চলাকালীন সময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অফিসের সামনে সামরিক জীপসমূহ ঘনঘন ঘোরাফেরা করতো। এ ধরনের এক রাতের ঘটনা। পীর মোহাম্মদ আশরাফ পরদিন সকালে ঘটনাটি আমাদেরকে শোনান। রাতে প্রচন্ড শীত পড়ছিল। আধ ঘন্টা পরপর জামায়াত অফিসের সামনে সামরিক বাহিনীর জীপ এসে থামছিল। গাড়ীর আওয়ায শোনার সাথে সাথে আমি লেপ ছেড়ে কম্বল গায়ে জড়িয়ে টেলিফোন রুমে গিয়ে বাইরে উঁকি দিতাম। প্রতিবারই দেখতাম যে, মাওলানা মওদূদী

www.nagorikpathagar.org

আগের মতোই আছেন। তিনি আমাকে বলতেন, আপনার বারবার ওঠার দরকার নেই। আপনি আরাম করুন। বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আপনাকে আমিই জানাবো। তীব্র শীতে বারবার বাইরে যাওয়া-আসার ফলে আমার সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিল। কিন্তু মাওলানা মওদূদী সুস্থই ছিলেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে মাওলানা মওদূদী ফিরোজপুর রোডের একটি মসজিদে ফজরের নামায আদায় করতেন। তারপর কয়েক মাইল পথ হাঁটতেন। এভাবে প্রতিদিন ভোরে তিনি ভ্রমণ করতেন। কিন্তু অসুখ বেড়ে যাওয়ায় প্রথমে প্রাত ভ্রমণ ত্যাগ করলেন। পরে মসজিদে যাওয়া ছেড়ে ঘরেই ফজরের নামায আদায় করতে লাগলেন।

মাওলানা মওদূদী সূর্যোদয়ের পর ঘন্টা খানেক ঘুমাতেন। ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নাশতা সেরে আটটা পৌনে আটটায় অফিসে যেতেন। অফিসে গিয়ে স্থানীয় সব সংবাদপত্র এক নজর দেখতেন। বিশেষ কোন রিপোর্ট বা নিবন্ধ মাঝে মাঝে পুরোটাই পাঠ করতেন। এরপর কোরআনের তাফসীর পাঠ শুরু করতেন। এভাবে শুরু হতো তাঁর দিনের ব্যস্ততা। হৃদরোগ বেড়ে যাওয়ার পর থেকে ফজরের নামায আদায়ের পর সকাল ৯টা পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে কাটাতেন। এরপর নাশতা খেয়ে ধীরে-সুস্থে দৈনন্দিন কাজ শুরু করতেন।

মাওলানা মওদূদীর সময়ের বৃহৎ অংশ মাসিক তরজুমানুল কোরআন এবং তাফহীমুল কোরআন রচনার কাজে ব্যয় হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তরজুমানুল কোরআনের আয়-ব্যয়ের হিসাবও তিনি নিজে লিখতেন। একই সাথে তাফসীর রচনার প্রস্তুতি হিসাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কোরআনে কারীম, আরবী তাফসীর এবং হাদীসে রসূল থেকে নোট নিতেন।

মাওলানার দফতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। এদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরাও থাকতেন। তারা নিজেদের এলাকার সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যা নিজ মুখে মাওলানার কাছে প্রকাশ করে তাঁর নিকট থেকে সরাসরি সমাধানের উপায় জেনে নিশ্চিন্ত হতেন। অন্য যারা আসতেন, তারাও অনেকে আসতেন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের উপায় মাওলানার নিকট থেকে জেনে নিতে। কেউ কেউ চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে পথ-নির্দেশ

www.nagorikpathagar.org

চাইতেন। লাহোরে যারা বসবাস করতেন, লাহোরে যারা বেড়াতে আসতেন এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী, ওলামায়ে কেরাম, আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রতিনিধি দল মাওলানার সাথে দেখা করতে আসতেন। এমনিভাবে মাওলানার রুম কখনো সম্মেলন কক্ষ, কখনো সংবাদ-সম্মেলন কক্ষে পরিণত হতো। গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় ঐক্য আন্দোলন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বৈঠক প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক এবং আনানুষ্ঠানিক বৈঠক মাওলানা মওদূদীর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হতো। এ ধরনের দৃশ্য আমি বহুবার দেখেছি। দেশে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মাওলানার অফিস কক্ষ সংবাদ সম্মেলনের কক্ষে পরিণত হতো। এই কক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনির্ধারিত সাক্ষাতকার ছাড়াও আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য সাক্ষাতকারের সময় নির্ধারিত ছিল। কখনো কখনো এমন হতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় লেগে থাকতো। মাওলানা মওদূদী এ সময়ে অধ্যয়ন এবং লেখার জন্য সময় বের করতে হিমশিম খেতেন। অনেকে টেলিফোনে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করে আসতেন। তবে তাদের সংখ্যা হতো কম। অধিকাংশই আসতেন কোন প্রকার সময় নির্ধারণ না করে। মাওলানা মওদূদী হয়তো তাফহীমুল কোরআন রচনা করছেন অথবা তরজমানুল কোরআনের জন্য কোন লেখা লিখছেন কিংবা জরুরী চিঠির জবাব লিখছেন এমনি সময়ে তাঁকে জানানো হতো যে, অমুক ব্যক্তি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। মাওলানা বিরক্ত হলেও চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতো না। তিনি কলম রেখে সাক্ষাৎ প্রার্থীর সামনে এসে বসে পড়তেন।

তাফহীমুল কোরআনের কোন অংশ লেখার সময়ে কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে হাযির হলে মাওলানাকে অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতো। আমরা বুঝতাম যে, তিনি কলম রেখে উঠে এলেও মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু চেহারায় সেই বিরক্তির কোন ছাপ লক্ষ্য করা যেতো না। তিনি চিন্তার ঊর্ধজগত থেকে নীচে নেমে আসতে বাধ্য হতেন।

শুধু তাফহীমুল কোরআন লেখার সময়েই এরকম পরিস্থিতি আমরা উপলব্ধি করতাম। অন্য সময়ে সাধারণ লেখার ব্যস্ততার সময়ে তিনি যখন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোন ডিকটেশন দিতেন, সেই সময় কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে

www.nagorikpathagar.org

তিনি প্রভাবিত হতেন না। সহজ স্বাভাবিকভাবে ডিকটেশন অসমাপ্ত রেখে আগন্তুকের সাথে আলাপ করতেন। আগন্তুক বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর অসমাপ্ত বাক্যের ঠিক শেষাংশ থেকে তিনি পুনরায় ডিকটেশন দিতেন।

অন্যান্য মুসলিম দেশের লোক পাকিস্তানে এলে মাওলানার সাথে দেখা করতেন। তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পেতো ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার উষ্ণতা। যারা এ দৃশ্য দেখতেন, তারা কখনো ভুলতে পারতেন না। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, আরব দেশসমূহ থেকে পাকিস্তানে আসা মুসলমানদের অত্যধিক আগ্রহ থাকতো মাওলানার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানোর।

আঙ্কারা থেকে পাকিস্তানে আসা সেই তুর্কী যুবকের চেহারা এখনো আমার চোখে ভাসে। স্টেশন থেকে গুলবার্গে সেই যুবক তার এক বন্ধুর কাছে ব্যাগ-ব্যাগেজ রাখতে যাচ্ছিল। সেখান থেকে মাওলানার সান্নিধ্যে আসার চিন্তা করছিল। কিন্তু মাজাংটুঙ্গি নামক জায়গায় তার ট্যাক্সি উল্টে যায়। যুবক গুরুতর আহত হয়। তাকে পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে যুবক বলল মওদূদী, মওদূদী। অর্থাৎ আমাকে মওদূদীর কাছে নিয়ে চলো। অন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে পথচারীরা যুবককে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিল। মাওলানা মওদূদীকে দেখে যুবকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে যেন তার সব ব্যথা সব কষ্ট ভুলে গেল। তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাওলানা তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। আফ্রিকা থেকে আসা একজন মুসলমান মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্যে এক ঘন্টা কাটালেন। সে সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেই আফ্রিকী বারবার বলছিলেন, 'প্লীজ কাম টু আস'। অনুগ্রহ করে আপনি আফ্রিকায় আসুন। আমাদের যুবকেরা মানসিক অস্থিরতায় দিশেহারা হয়ে পড়লে আপনার লেখা গ্রন্থ পাঠ করে মানসিক শান্তি এবং পথ-নির্দেশ লাভ করে।

তিউনিসিয়ার একজন নেতা একবার মাওলানার সান্নিধ্যে এসে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকিয়ে রইলেন। এক সময় বললেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম, জীবদ্দশায় একবার যেন মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলন যে দেশেই হচ্ছে, সে দেশের নেতারাই মাওলানার কাছে বিভিন্ন সময় ছুটে আসতেন। তারা মাওলানার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতেন।

সকাল ১১ টায় ডাক আসতো। প্রতিদিন মাওলানার নামে ৪০ থেকে ৫০টি চিঠি আসতো, উর্দু, ইংরেজী, আরবী এবং বাংলা ভাষায় এসব চিঠি লেখা থাকতো। বাংলা ভাষায় লেখা চিঠির বক্তব্য মাওলানাকে অনুবাদ করে শোনানো হতো। অনেক সময় মাওলানা চিঠির গায়েই জবাব লিখে দিতেন। মালিক গোলাম আলী, খলিল হামিদী, মোহাম্মদ সুলতান এবং ফয়জুর রহমানের সহায়তায় এসব চিঠির জবাব তৈরী করে বা টাইপ করিয়ে মাওলানার স্বাক্ষরের জন্য তাঁর সামনে নিয়ে যেতেন। তারপর সেসব চিঠি ডাকে দেয়া হতো। সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কিত চিঠির জবাব দিতেন চৌধুরী মোহাম্মদ আসলাম সালিমী এবং চৌধুরী রহমত এলাহী। বিষয় ভিত্তিক কিছু চিঠির জবাব প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে দেয়া হতো। আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রতিদিন সাত-আট খানি চিঠি আসতো। এসব চিঠির জবাব জনসেবা বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ফকির হোসেন এবং মোহাম্মদ ইবরাহীম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

কোন কোন লেখক তাদের গ্রন্থ প্রকাশের আগে একটু দেখে দেয়ার জন্য মাওলানার কাছে পাঠাতেন। কেউ তার লেখা বইয়ের ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য পাঠাতেন। কেউ কেউ নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখা শুরুর আগে মাওলানার সাথে পরামর্শ করতে আসতেন যে, লেখাটা কিভাবে শুরু করবেন। প্রতি সপ্তাহে দুই-তিন প্যাকেট বই ডাক যোগে আসতো। বিভিন্ন দেশে বিদেশী ভাষায় মাওলানার অনূদিত গ্রন্থাবলীর কপিই সাধারণত এসব প্যাকেটে থাকতো। এসব বইয়ের প্রকাশনার মান খুবই উন্নত এবং মূল্য তুলনামূলক কম। বিশ্বের ২২টি ভাষায় *(এটি ১৯৭২ সনের কথা)* মাওলানা মওদূদীর বই অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের সব দেশেই কম-বেশী মাওলানা মওদূদীর বই পাওয়া যায়।

দেশের বিভিন্ন এলাকা এবং বিদেশ থেকে প্রতি সপ্তাহে মাওলানার কাছে দশ-বারোটি টেলিগ্রাম আসতো। সাধারণত এসব টেলিগ্রামে বিশেষ কোন সমস্যার প্রতি মাওলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু বক্তব্য আশা করা হতো।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা সাথে সাথে জবাব দিতেন এবং টেলিগ্রামকারীর অনুরোধ রক্ষা করতেন।

প্রতিদিনের ডাকে আরব দেশসমূহ থেকে আরবী সংবাদপত্র আসতো। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সংবাদপত্রে মাওলানার লেখা বা বক্তব্য এতো বেশী গুরুত্ব সহকারে ছাপা হতো যে, পাকিস্তানী সংবাদপত্রের কভারেজ ম্লান হয়ে যেতো। মুসলিম বিশ্ব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী সব সময় খবর রাখতেন। আরবী সংবাদপত্র ও সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা তিনি মোটামুটি পড়তেন। ব্যাপক পড়াশোনার দায়িত্ব খলিল হামিদীর ওপর ন্যস্ত ছিল। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাও মাওলানা নিয়মিত পাঠ করতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সাময়িক পত্রিকাসমূহ নিয়মিত মাওলানার নামে আসতো। বিভিন্ন দূতাবাস থেকে ম্যাগাজিন এবং সংবাদ বুলেটিন মাওলানাকে প্রেরণ করা হতো। প্রতি মাসে দু'তিনজন বিদেশী সাংবাদিক মাওলানার সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য আসতেন। এদের মধ্যে টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়েও কেউ কেউ আসতেন। কিন্তু আগে সময় নির্ধারণ করে না এলে মাওলানা সাক্ষাতকার দিতেন না। যারা নিয়ম মেনে সাক্ষাতকার গ্রহণের সুযোগ পেতেন, তারা মাওলানার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে অভিভূত হয়ে যেতেন।

দুপুর দেড়টায় মাওলানা সহকর্মীদের নিয়ে যোহরের নামায আদায় করতেন। যোহরের পর ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে আসর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন।

আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ৫-এ ঝিলদার পার্কে নিয়মিত বৈঠক বসতো। এ বৈঠকে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হতো। এই মজলিসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিশেষত লাহোরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগ্রহী ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করতেন। সউদী আরব, জর্দান, কুয়েত, মিসর, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আসা ব্যক্তিগণও এই মজলিসে যোগদান করতেন। ইংরেজী, আরবী, পাঞ্জাবী বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন করা হতো। মাওলানা প্রশ্নকারীকে তার মাতৃভাষাতেই জবাব দিতেন। ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, উদীয়মান কবি, নবীন বক্তা অপরিমেয় আবেগ নিয়ে মাওলানার

www.nagorikpathagar.org

বৈকালিক মজলিসে হাযির হতেন। তারা নিজ নিজ সমস্যা, প্রয়োজন, আবেগ প্রকাশ করতেন এবং মাওলানার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর মন্তব্য শুনতে চাইতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না। ইসলামের শত্রুরা, ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদের নানা রকম জটিল প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে মাওলানা মওদূদীর বৈকালিক মজলিসে পাঠাতো। মাওলানা তাদেরকে সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় জবাব দিতেন। প্রশ্নকারী যুবকেরা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারতো এবং মাওলানার জ্ঞানের গভীরতা, ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ-অভিভূত হয়ে ফিরে যেতো। এ ধরনের যুবকদের কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীতে পরিণত হয়েছে। বিভ্রান্ত এক যুবককে স্বার্থান্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ কিছু মৌলবী একবার মাওলানার প্রাণনাশের জন্য পাঠিয়েছিল। আঘাত করার আগে যুবক মাওলানার কয়েকটি মিঠা মিঠা কথা শুনে মাওলানার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিয়মিত এই বৈকালিক মজলিস চলতে থাকে। পরবর্তীকালে মাওলানার ক্রমবর্ধমান অসুস্থতার কারণে এই মজলিস বন্ধ করে দেয়া হয়।

এশার নামাযের পর মাওলানা ঘরে ফিরতেন এবং রাতের খাবার খেতেন। এ সময় তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলতেন এবং ছেলেমেয়েদের কিছুক্ষণ সময় দিতেন। এরপর অফিসে এসে পড়ালেখা শুরু করতেন।

একটি মোমবাতি নিজে গলে গিয়ে পুড়ে গিয়ে অন্যদেরকে আলো দেয়। সমুদ্রের বাতিঘর দূরের পথিকদের সঠিক পথের নিশানা দেখায়। মাওলানা মওদূদী ঠিক তেমনি ধরনের এক নেয়ামত। দৈনন্দিন জীবনে মাওলানার কর্মব্যস্ততার এক ঝলক তুলে ধরা হলো। ইসলামের জন্য যারা কাজ করেন এতে তারা পাথেয় খুঁজেন। ১৯১৭ সালে মাত্র পনের বছরের এক যুবক সাংবাদিকতার জগতে পা রেখেছিলেন। কোরআন-হাদীস গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সঠিক পথ। মাওলানা মওদূদীর জীবনে কোন গোপনীয়তা নেই, কোন অস্পষ্টতা নেই। তাঁর জীবন হচ্ছে একটি খোলা বইয়ের মতো। সেই বইয়ের প্রতিটি পাতায় রয়েছে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর। জীবনের প্রতিটি দিন তিনি মর্দে মোজাহেদদের মতোই কাটিয়েছেন, তাঁর সমগ্র জীবন এক অনুসরণযোগ্য আদর্শ।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদীর অসামান্য লেখনী প্রতিভা

আখলাক হোসেন

> *মাওলানা বললেন, সূরা নমল-এর ''নমল' প্রান্তরের অবস্থান জানার চেষ্টা করছি। এটা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের কথা। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে তরজুমানুল কোরআনে সূরা নমল-এর তাফসীর প্রকাশিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে প্রায় একবছর পড়াশোনার পর মাওলানা মওদূদী সূরা নমল-এর তাফসীর লিখেছিলেন।*

মাওলানা মওদূদীর লেখার সাথে যাদের পরিচয় রয়েছে তারা সবাই জানেন যে, তিনি প্রতিটি লেখায় গবেষণার ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু খুব কম মানুষই এটা জানেন যে, মাওলানার গবেষণা এবং পড়াশোনার ব্যাপকতা কতো গভীর। তাঁর লেখার প্রতিটি লাইন তাঁর অনন্যসাধারণ চিন্তাধারা এবং গবেষণার নির্যাস।

বহু বছর যাবত মাওলানা মওদূদীর লেখা গ্রন্থের একজন প্রকাশক হিসাবে তাকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এসব ঘটনা থেকে মাওলানার গবেষণা ও পরিশ্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির কয়েক দিন পর মাওলানা মওদূদী করাচী সফরে যান। করাচীতে তাঁর সফর ব্যবস্থাপনার বেশীর ভাগ দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত থাকায় তাঁকে তখন খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাঁর সফরকালীন জিনিসপত্র সাজানোর সময় বহু ইংরেজী ও আরবী গ্রন্থ টেবিলে রাখতে হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বর্তমানে আপনি কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। মাওলানা বললেন, সূরা নমল-এ 'নমল' প্রান্তরের কথা উল্লেখ রয়েছে। নমল প্রান্তরের অবস্থান জানার চেষ্টা করছি। এটা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের কথা। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে তরজুমানুল কোরআনে

www.nagorikpathagar.org

সূরা নমল-এর তাফসীর প্রকাশিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে প্রায় একবছর পড়াশোনার পর মাওলানা মওদূদী সূরা নমল-এর তাফসীর লিখেছিলেন।

১৯৬০ সালের শুরুতে মাওলানা মওদূদী পুনরায় করাচী সফর করেন। আসরের নামাযের পর মাওলানার সাথে বারান্দায় বসেছিলাম। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। আলাপকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল এবং ইসলামের ইতিহাস কিছু লোক বিকৃত করার চেষ্টা করছে এ মর্মে উভয়ে মতবিনিময় করছিলেন। এক পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী বললেন, উল্লিখিত বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা ইসলামের ইতিহাস বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে, তাদের অপচেষ্টা এতে নস্যাৎ হয়ে যাবে। ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত রূপরেখা এতে তুলে ধরা হবে।

পাঁচ বছর পর ১৯৬৫ সালে প্রথম মাসিক তরজুমানুল কোরআনে সেই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে 'খেলাফত ও মুলুকিয়ত' অর্থাৎ ইসলাম ও রাজতন্ত্র নামে বিখ্যাত সেই ধারাবাহিক রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাইয়েদ আসাদ গিলানী বলেছেন, একদিন তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর অফিসে যান। তিনি লক্ষ্য করলেন টেবিলে অনেকগুলো মোটা মোটা বই আর মাওলানা তাফহীমুল কোরআন লিখছেন। আসাদ গিলানীর প্রতি তাকানোর পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনার চারিপাশে এতো মোটা মোটা বই অথচ কোন বইয়ের ভেতর কাগজের স্লিপ দিয়ে নিশানা দেয়া হয়নি, উদ্ধৃতিসমূহ কিভাবে আপনি মনে রাখেন?

মাওলানা মওদূদী বললেন, তাফহীমুল কোরআন লেখার ক্ষেত্রে আমার নিয়ম হচ্ছে, কোন উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হলে প্রথমে সেই উদ্ধৃতি একটি কাগজে লিখে ফেলি। তারপর অনেকগুলো উদ্ধৃতি থেকে বাছাই করে কিছু উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স তাফহীমুল কোরআনে ব্যবহার করি। অন্যদিকে উদ্ধৃতি হিসাবে সংকলিত কাগজগুলোও সংরক্ষণ করি। তাফহীমুল কোরআনে এমন একটি উদ্ধৃতিও আমি ব্যবহার করিনি যার বরাত আমার কাছে নেই।

www.nagorikpathagar.org

সাইয়েদ আসাদ গিলানী বলেন. মাওলানার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এতো কষ্টের এতো পরিশ্রমের কথা কি চিন্তা করা যায়? লেখালেখির সাথে যারা জড়িত আছেন তারা এই পরিশ্রমের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। বই পড়া এমনিতেই পরিশ্রমের কাজ। পঠিত বই থেকে অংশ বিশেষ লিখে রাখাও পরিশ্রমের কাজ। তারপর উদ্ধৃতিসমূহ যাচাই-বাছাই করে সুবিন্যস্ত করা একটি গ্রন্থ রচনার মতো কষ্টসাধ্য। সেই সব উদ্ধৃতি অন্য একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মতো পরিশ্রম তাফহীমুল কোরআন রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব।

মালিক গোলাম আলী একবার আমাকে বলেছিলেন, পাঠানকোটে মাওলানা মওদূদী লেখার টেবিলে বসে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকতেন। বলতেন, অমুক আলমারিতে এই নামে একটি বই আছে। সেই বইয়ের অতো নম্বর পৃষ্ঠা বের করুন। মাওলানার কথা অনুযায়ী আমি পৃষ্ঠা নম্বর বের করে তাঁর সামনে রাখতাম। এমনি অসাধারণ ছিল মাওলানা মওদূদীর স্মৃতিশক্তি।

১৯৬২ সালের রমযান মাসে আমার প্রকাশক জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর একটি ঘটনা ঘটে। রমযানের এক বিকেলে প্রকাশিতব্য একটি বই সম্পর্কে পরামর্শের জন্য মাওলানা মওদূদীর নিকট গেলাম। আমার কথা ও কাজ শেষ হওয়ার পর মাওলানা বললেন, 'খতমে নবুয়ত' সম্পর্কে আজ রাতে আমি কিছু লিখতে মনস্থ করেছি। আগামীকাল সকালে এসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবেন। পরদিন অফিসে গেলাম। সকাল ১০টায় মাওলানা টেলিফোন করলেন। বললেন, পান্ডুলিপি তৈরী হয়ে গেছে, নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি মাওলানার কাছে গিয়ে পান্ডুলিপি গ্রহণ করলাম। ৭২ পৃষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাওলানা বললেন, গত রাতে তারাবীহ্ নামায শেষে লিখতে বসেছিলাম। সেহরীর সময়ে লেখা শেষ হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর লেখক-সত্তার এটা এক বিস্ময়কর পরিচয়। এ ধরনের অসাধারণ লেখনীশক্তির পাশাপাশি চিন্তার একাগ্রতা বহুমুখী কাজের ব্যস্ততা, এখলাস তথা আমলের পরিচ্ছন্নতার প্রকাশ একমাত্র মাওলানা মওদূদীর পক্ষেই সম্ভব। এ কারণেই একই বৈঠকে মাত্র ছয়-সাত ঘন্টায় মাওলানা মওদূদী খতমে নবুয়তের মতো অসাধারণ একটি গ্রন্থ মুসলিম জাতিকে উপহার দিতে পেরেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মওদূদীঃ একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ

আবু সলিম আবদুল হাই

> *১৯৪১ সালের ২৬ শে আগস্ট লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময়ের কিছু পুরানো কথা বলছি। তখন সারাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৫ জন এবং মূলধন ছিল ৭৪ টাকা ১৪ পয়সা। পরবর্তি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআন লেখা শুরু করেন।*

মাওলানা মওদূদী একজন বড় মাপের মানুষ—এক অসাধারণ মেধা সম্পন্ন আলেমে দ্বীন। তিনি একজন ব্যক্তি নন বরং একটি প্রতিজ্ঞা। একটি ইতিহাস। তাঁর সম্পর্কে বলা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন জাতি এ ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন লাভ করে না। তিনি এমন এক মহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবার তেরোশত বছর পর্যন্ত দ্বীনের তাবলীগ এবং হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত ছিল। মামা কুতুবুদ্দীন মওদূদী ছিলেন এই পরিবারের প্রাচীন পুরুষ। তিনি ছিলেন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরীর দাদাপীর। মওদূদীয়া খান্দানের যে শাখার সাথে মাওলানা মওদূদীর সম্পর্ক তারা হিজরী নবম শতাব্দীতে ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেন।

আবুল আলা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন আওরঙ্গাবাদে। সেখানে তাঁর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান ওকালতি করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ। তিনি মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন না। এ কারণে আইন ব্যবসায় তেমন সাফল্য আসেনি। কিন্তু অর্থোপার্জনের চিন্তা তাঁকে কখনো নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জন্মের পর পিতা নবজাতকের নাম আবুল আলা রাখেন এবং ছেলেকে পুরোপুরি দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

www.nagorikpathagar.org

ইংরাজী শিক্ষার ধারে-কাছে দিয়েও যাননি। মাওলানা মওদূদী নয় বছর বয়স পর্যন্ত ঘরেই লেখাপড়া করেন। এরপর তাঁকে আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসায়ে ফাওকানিয়ায় ভর্তি করা হয়। ১৯১৪ সালে তিনি সেখানে উচ্চতর পরীক্ষা দেন। সেই মাদ্রাসার সুপার ছিলেন মাওলানা হামিদ উদ্দীন ফারাহি।

কয়েক বছর পর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান ইন্তেকাল করেন। মাওলানা তাঁর বড় ভাই আবুল খায়ের মওদূদীর সাথে জীবন সংগ্রাম শুরু করেন। লেখাপড়ার আগ্রহ ছিল খোদা প্রদত্ত। বন্ধু-বান্ধবরাও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করেন। একারণে সেই সময়েই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কলমের মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করবেন। তাঁর বড় ভাই আবুল খায়ের মওদূদী ছিলেন বিজনৌর থেকে প্রকাশিত 'আখবারে মদীনার' সম্পাদক। মাওলানা বড় ভাইয়ের সাথে বিজনৌয় চলে যান এবং সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন।

সেই সময় সারাদেশে ছিল খেলাফত আন্দোলনের জোয়ার। মাওলানার বয়স তখন মাত্র সতের বছর। সেই সময়েই তিনি 'আনজুমানে এয়ানতে নজরবান্দানে ইসলাম'-এ কাজ করতে শুরু করেন।

এই সময়ে তাজউদ্দীন সাহেব ভূপাল থেকে 'তাজ' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। মাওলানা মওদূদীর যোগ্যতায় প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁকে এর সম্পাদক নিয়োগ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাওলানার লেখা একটি রিপোর্টের কারণে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। ১৯২১ সালে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ 'মুসলিম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। মুফতী কেফায়েত উল্লাহ এবং মাওলানা আহমদ সাঈদ মাওলানা মওদূদীকে এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এরপর তাও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৫ সালে 'আল জমিয়ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বও মাওলানা মওদূদীর ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মাওলানা মওদূদী 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এরপর তিনি নিজে লেখালেখির কাজে মনোযোগী হবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হায়দারাবাদে চলে যান। সেখা য়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

মাওলানা মওদূদী স্বভাবগতভাবে যে কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন। তারপর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন। খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তুর্কী জাতির নেতৃত্বে এমন

www.nagorikpathagar.org

লোকেরা রয়েছে যারা জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মহীনতাকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর ফলে আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা তুর্কীদের শত্রুতে পরিণত হয়। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে মাওলানা মওদূদী বুঝতে পারেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা যে খেলাফতের সহায়তা করছে সেই খেলাফত আন্দোলন সম্পূর্ণ নিরর্থক।

একইভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে চিন্তা করে মাওলানা মওদূদী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইংরেজরা ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে একটি জাতি হিসাবেই বিবেচনা করছে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করছে। ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা সেই আলোকে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করছে। মাওলানা ভেবে দেখলেন এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯২৫ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ১৯২৬ সালে একজন মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে। এর ফলে ইসলামের জেহাদ দর্শন সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মাওলানা সেই জন-বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কলম হাতে নেন। তিনি 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এটি এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং অসাধারণ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ।

জেহাদ সম্পর্কে বিশাল গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনে মাওলানা মওদূদীকে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হয়েছিল। ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে মাওলানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় উন্নীত করা বাস্তবায়িত করা। জেহাদের আসল উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইসলামকে একটি বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মহীনতা এবং পৌত্তলিকতা প্রসারিত হচ্ছিল। কমিউনিজমের প্রভাব বাড়ছিল। আলীগড় কমিউনিজম আন্দোলনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। মুসলমানরা একটি পশ্চাৎপদ জাতির প্রকৃতি নিয়ে কংগ্রেসের সাথে অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলমানদের এরকম দুরবস্থা লক্ষ্য করে কংগ্রেস তাদের সাফ সাফ জানিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকবে। তোমরা এলে তোমাদের সাথে নেবো, যদি না আসো তবে তোমাদেরকে বাদ দিয়েই আমরা আন্দোলন চালিয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাব। যদি তোমরা প্রতিবাদ করো তাতে লাভ নেই, সেই প্রতিবাদের মধ্যেও আমরা সামনে এগিয়ে যাব। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিছু সংখ্যক মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করে। কিছু সংখ্যক মুসলমান মুসলিম লীগ গঠন করে। আর কিছু লোক ভিন্নমত অবলম্বন করে বিভক্ত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এদের কারোই ইসলামের কথা মনে আসেনি। ইসলাম যে একটি ধর্ম মাত্র নয় বরং একটি জীবন ব্যবস্থা এ কথা কারো চিন্তায় জাগেনি। ইসলামের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এ সব ব্যবস্থা বিশ্বের অন্য সকল ব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী ১৯৩২ সালে হায়দারাবাদ থেকে তরজুমানুল কোরআন বের করতে শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে এই পত্রিকায় মাওলানার সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'ইসলাম আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে আল্লামা ইকবালের সাথে মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি মাওলানাকে লাহোরে চলে আসার পরামর্শ দেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে মাওলানা মওদূদী লাহোর চলে যান। ১৯৩৯ সালে মুসলিম গণ-জাগরণ শুরু হয়। এসময়ে মাওলানা যেসব ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন পরবর্তী সময়ে সেগুলো সংকলিত হয়ে 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশামাকাশ'-এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। এসব লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই ছিল মুসলমানরা যেন অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে নিজেদেরকে লীন করে না ফেলে। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়। মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করেন যে, মুসলিম শাসন এবং ইসলামী শাসন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে এসব লেখা সংকলিত হয়।

মাওলানার লেখা এসব লেখার যতোটা প্রতিক্রিয়া আশা করা গিয়েছিল ততোটা হয়নি। মদ্যপানের জলসায় তোতাপাখির গান কে শোনে। এরকম পরিস্থিতিতে মাওলানা এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার তাকীদ অনুভব করেন যে সংগঠন মুসলমানদের পরিবর্তে ইসলামের জন্য কাজ করবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, এই দলে এমন লোক শামিল হবেন যারা শুধু চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই পরিচ্ছন্ন

www.nagorikpathagar.org

হবেন না বরং কর্মক্ষেত্রেও হবেন নির্ভরযোগ্য। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি একটি শক্তিশালী দল গঠনে উদ্যোগী হন। তিনি পরিকল্পিত দলে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর লোক শামিল করার কথা চিন্তা করেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর লোকদের তিনি সমন্বয় সাধন করতে চান। কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের একই প্লাটফর্মে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আহলে হাদীস, দেওবন্দী, বেরেলভী সকল মতের অনুসারীদেরকেই জামায়াতে ইসলামীতে শামিল করা হয়েছে।

১৯৪১ সালের ২৬ শে আগস্ট লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময় জামায়াতের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৫ জন এবং মূলধন ছিল ৭৪ টাকা ১৪ পয়সা।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানা মওদূদী 'তাফহীমুল কোরআন' লেখা শুরু করেন। জামায়াতে ইসলামীর নীতি ও আদর্শের প্রচার-প্রসারে এই তাফসীরের গুরুত্ব অসাধারণ। সময় গড়িয়ে যায়। আসে ১৯৪৭ সাল। সারাদেশে রক্তের নদী বইতে থাকে। চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। মাওলানার অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। বক্তৃতা করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা ছিল খুব বিখ্যাত। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, মুসলমানদের ওপর একটি কঠিন সময় এগিয়ে আসছে। ধৈর্যের সাথে সেই সময় অতিক্রম করতে হবে। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করে প্রকাশ করতে হবে। মুসলমানরাও যেন ইসলামের সত্যিকার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য লোকদের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তিও নিরসন করতে হবে।

দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬২৫ জন। এদের মধ্যে ৩৫৮ জন পাকিস্তানে অবশিষ্টরা ছিলেন ভারতে। কিছুকাল পর কাশ্মীর জামায়াতে ইসলামী পৃথক হয়ে যায় এবং ভারত ও পাকিস্তান জামায়াত পরস্পর সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাওলানা মওদূদী দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। এ অপরাধে ১৯৪৮ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫০ সালে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তির পর তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবী করেন। এ অপরাধে ১৯৫৩ সালে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ ঘটনা

www.nagorikpathagar.org

আলোড়ন সৃষ্টি করে। তীব্র প্রতিবাদের মুখে মৃত্যুদন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তন করা হয়। জেলখানায় বসে মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআন লিখতে থাকেন। জেলখানার বাইরে তখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী তীব্র হচ্ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে এ শাসনতন্ত্র স্থগিত করা হয়। একই সালে মাওলানা মুক্তিলাভ করেন। এ সময়ে মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআনের কাজে পূর্ণতার প্রয়োজনে সউদী আরব সফর করেন। কোরআনে উল্লিখিত স্থান ও নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

১৯৬৭ সালে মাওলানা মওদূদীকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু আদালত এই গ্রেফতারকে বেআইনী ঘোষণা করে। ফলে মাওলানা মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে চিকিৎসার জন্য মাওলানা মওদূদী লন্ডন যান। ফিরে এসে তাফহীমুল কোরআন রচনায় মনোযোগী হন। ১৯৭২ সালের ৭ই জুন অর্থাৎ ১৩৯২ হিজরীর ২৪শে রবিউস সানী তাফহীমুল কোরআন রচনা শেষ হয়। এ বিরাট তাফসীর রচনায় প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল।

তাফহীমুল কোরআন রচনার পাশাপাশি মাওলানা মওদূদী বহু সংখ্যক অন্যান্য গ্রন্থ এবং প্রচারপত্র রচনা করেন।

মাওলানা মওদূদী অন্যান্য গ্রন্থ রচনা না করে যদি শুধু তাফহীমুল কোরআন রচনা করতেন, তবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট। তিনি একজন অসাধারণ লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। তিনি ছিলেন একাধারে মোফাসসের, মোজতাহেদ, বক্তা, আলেম, দ্বীনের মহান মোজাহেদ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, নেতা, সংগঠক, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ সর্বোপরি আমল-আখলাকে একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ।

মাওলানা মওদূদী জাতীয় পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রশিক্ষক। চারিত্রিক অধঃপতন রোধ করার জন্য তিনি সংগঠন তৈরী করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বহুসংখ্যক বক্তা গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে ময়দানে নামিয়ে দেন। জনসেবার জন্য আলাদা সংগঠন তৈরী করেন। মহিলাদের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেন। যুবকদের সংগঠিত করেন। জাতিকে নেতৃত্ব দেন।

www.nagorikpathagar.org

ফাঁসীর কক্ষে তাকে দেখেছি নির্ভীক

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ

কামরার বাইরে রাখা পানি দিয়ে উযু করেছেন এবং এশার নামায আদায় করেছেন। নামায শেষে দুই ফুট প্রস্থ সাড়ে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ বিশিষ্ট চটের বিছানায় বিনা বালিশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাহারাদার তো বিস্ময়ে নির্বাক। সে ভাবলো কেমন মানুষ ইনি? ফাঁসীর আসামীরা তো এমন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না?

১১ই মে ১৯৫৩ সাল। সূর্য অস্ত গেছে। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের দেওয়ানী ওয়ার্ডের বারান্দায় আমরা মাগরেবের নামায আদায় করছিলাম। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, চৌধুরী মোহাম্মদ আকবর, মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, সাইয়েদ নকী আলী এবং আমি। মাওলানা মওদূদী নামাযে ইমামতি করছিলেন। হঠাৎ খট করে দেওয়ানী ঘরের ভেতরের দিকের দরযা খুলে গেল। পনের-বিশজন অফিসার এবং ওয়ার্ডার আঙ্গিনায় এসে হাযির হলো। আমাদেরকে নামায আদায় করতে দেখে তারা থেমে গেল। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রাকআত আদায় করা হচ্ছিল। সালাম ফেরানোর পর আমরা লক্ষ্য করলাম দু'তিন জন সামরিক অফিসার, জেল সুপার, অন্যান্য অফিসার এবং অধস্তন কর্মচারী। মোনাজাত করে আমরা সুন্নত আদায় করতে চাইলাম। তারা বলল, হাঁ হাঁ। ঠিক আছে, আপনারা নামায আদায় করে নিন।

নামায শেষে আমরা তাদের প্রতি তাকালাম। একজন সামরিক অফিসারের হাতে ছিল একটা ফাইল। তিনি সামনে এগিয়ে এসে বললেন, মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয কে? মালিক বললেন, জী আমি। অফিসার সিদ্ধান্ত পড়ে জানালেন যে, ওলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার করার পর মাওলানা মওদূদীর বিবৃতি

www.nagorikpathagar.org

আপনার সম্পাদিত তাসনীম পত্রিকায় ৫ই মার্চ ১৯৫৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবৃতি প্রকাশের অপরাধে আপনাকে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। অফিসার এর পর বললেন, সৈয়দ নকী আলী কে? নকী আলী বললেন, জী আমি, অফিসার বললেন, মাওলানা মওদূদীর লেখা 'কাদিয়ানী মাসআলা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশের অপরাধে আপনাকে নয় বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। এরপর অফিসার মাওলানা মওদূদীর চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কাদিয়ানী মাসআলা' প্রচারপত্র লেখার অপরাধে আপনাকে মৃত্যুদন্ডের সাজা দেয়া হলো। এছাড়া ওলামাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেয়ার অপরাধে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। সামরিক আদালতে দেয়া শাস্তির বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করার অধিকার নেই। তবে আপনি ইচ্ছে করলে মৃত্যুদন্ডের সাজার বিরুদ্ধে সাত দিনের মধ্যে কমান্ডার ইন চীফের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

মাওলানা মওদূদীর চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল। অকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি কোন আপীল করব না। জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা যমীনে নয়—আসমানে হয়ে থাকে। ওখানে যদি আমার মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে থাকে তবে দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে বাঁচাতে পারবে না আর যদি ওখানে মৃত্যুর ফায়সালা না হয়ে থাকে, তবে দুনিয়ার কোন শক্তি আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব হয়ে থাকলেন। এরপর অফিসাররা অভিযুক্ত তিনজনকে বললেন, আপনারা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। মালিক নসরুল্লাহ খান এবং সৈয়দ নকী আলী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সেলে যাবেন আর মওলানা মওদূদী যাবেন ফাঁসীর আসামীদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে।

অন্য সঙ্গীদের কথা বলতে পারব না, তবে আমার তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ধারালো ব্লেডে দেহের কোন অংশ হঠাৎ কেটে যাওয়ার সাথে সাথে যেমন ব্যথা থাকে না—অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়—আমার অবস্থা হলো ঠিক সেই রকম। আমি চুপচাপ সব দেখছিলাম আর শুনছিলাম।

মাওলানা মওদূদী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি নিজের বিছানা এবং বই সঙ্গে নেবেন কিনা। অফিসার বললেন, শুধু এক জিলদ কোরআন শরীফ ছাড়া আর কিছুই আপনি সঙ্গে নিতে পারবেন না। বিছানা এবং পোশাক আপনি

www.nagorikpathagar.org

ওখানেই পাবেন। মাওলানা মওদূদী চপ্পল রেখে জুতো পায়ে দিলেন। সাদা টুপি রেখে কালো টুপি পরিধান করলেন। এরপর আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করে রওয়ানা হলেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে সাময়িকভাবে কোথাও প্রয়োজনীয় কাজে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর একজন জেল ওয়ার্ডার মাওলানার জামা-জুতো নিয়ে এলো। সে বলল, জেলখানার নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে খদ্দরের জামা এবং ফিতাবিহীন পায়জামা দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি নিজের এসব জামা-কাপড় কাছে রাখবেন এমন নিয়ম নেই। আমীন আহসান ইসলাহীর প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষণীয়। তিনি মাওলানার জামা-কাপড় কখনো চোখে কখনো বুকে কখনো মাথায় রাখছিলেন আর কাঁদছিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মওদূদীকে আমি অনেক বড় মানুষ মনে করি। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর মর্যাদা এতো যে উচ্চতর এটা আমার জানা ছিল না।

চৌধুরী মোহাম্মদ আকবরও কাঁদছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হলো আদালতে আপীল করা যাবে না শুধু প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানাতে হবে এক ব্যক্তির নিকট অথচ সেই প্রস্তাবও মাওলানা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এর পরিণাম কি হতে পারে এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে আমি এক কোণে চলে গেলাম। কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কখনো মনে হচ্ছিল আল্লাহ পাক মাওলানা মওদূদীর মতো লোককে এসব লোকের করুণার ওপর ছেড়ে দেবেন এটা হতে পারে না। পরক্ষণে মনে হচ্ছিল বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাজ তো বন্ধ থাকে না। ব্যক্তি অপরিহার্য নয়। আল্লাহর এই যমীনে কিছু নিকৃষ্ট মানুষের হাতে নবীদের শিরশ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে করাতে চিরে হত্যা করা হয়েছে। লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের গোশত তুলে নেয়া হয়েছে। আল্লাহর জমিনে প্রতিদিন লাখ লাখ ফুল ফোটে আবার সেসব মাটিতে মিশে যায় কেউ তার খবর রাখে না। এমতাবস্থায় একজন মওদূদী এবং তাঁর আমাদের মতো গুনাহগার কিছু সঙ্গী-সাথীর অভাবে কোন্ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? রাতের অধিক সময় এসব চিন্তায় কাটালাম।

পরদিন জেল ওয়ার্ডেন এবং অন্যদের মুখে মাওলানার রাত্রি যাপনের বিবরণ শুনলাম। মাওলানা ফাঁসীর আসামীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধান

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, কামরার বাইরে রাখা পানি দিয়ে উযু করেছেন এবং এশার নামায আদায় করেছেন। নামায শেষে দুই ফুট প্রস্থ সাড়ে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ বিশিষ্ট চটের বিছানায় বিনা বালিশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাহারাদার তো বিস্ময়ে নির্বাক। সে ভাবলো এ কেমন মানুষ? ফাঁসীর আসামীরা তো এমন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না?

আমরা অধিকাংশ সময় নামায, দোয়া এবং কোরআন তেলাওয়াত করে কাটাচ্ছিলাম। জেলখানায় প্রায় সবাই ছিলেন আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। জেলখানার বাইরে মাওলানা মওদূদীর ফাঁসীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। মুসলিম বিশ্বে এবং অমুসলিম দেশসমূহে মুসলিম জনগণ তারবার্তায় মাওলানা মওদূদীর ফাঁসীর আদেশ প্রত্যাহার করার দাবী জানাতে থাকলো। অবস্থা বেগতিক দেখে গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হলেন। ১৩ই মে ১৯৫৩ তারিখে সরকার ঘোষণা প্রচার করলো যে, মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদন্ডাদেশ বিশেষ বিবেচনায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তন করা হলো। মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসীর আসামীর ক্ষুদ্র কামরা থেকে জেলখানার বি-ক্লাশ ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হলো। আমাদেরকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হলো। আমরা সেখানে গেলাম। মাওলানাকে তৃষ্ণার্ত চোখে দেখতে লাগলাম। মাওলানার জামা-কাপড় এবং ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিস বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি একটি জামা, একটি পায়জামা এবং ধোয়া দুইখানা বিছানার চাদর সঙ্গে নিয়েছিলাম। মাওলানাকে সেগুলো দিলাম। মোটা খদ্দরের জামা-পায়জামায় মাওলানা মওদূদীকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর লাল সাদা চেহারা ঝলমল করছিল। তাঁর আফসোস ছিল যে, আল্লাহর পথে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন তাঁর সম্ভব হলো না।

●

জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য ঘরে বসে মাওলানার মৃত্যুদন্ডাদেশের খবর পেলেন। ঘরে কাউকে কিছু না বলে তিনি সাথে সাথে করাচীতে জামায়াত অফিসে চলে এলেন। কিছুক্ষণ পর একজন খবর দিল যে, একজন মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চান। বাইরে এসে তিনি দেখেন তার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন। স্ত্রী স্বামীকে বললেন, দেখুন এটা কঠিন পরীক্ষার সময়। ভেঙ্গে পড়লে

www.nagorikpathagar.org

চলবে না। মাওলানার বন্ধুত্বের মর্যাদা দিন। ফাঁসীর মঞ্চ পর্যন্ত আপনি যেন মাওলানার পাশে থাকেন আমি সেটাই চাই।

স্বামীকে এসব কথা বলে মহিলা দ্রুত অন্যান্য মহিলার সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

(মরহুম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ)

●

ফিলিস্তিনের মুফতীয়ে আযম আলহাজ্জ মোহাম্মদ আমীন আলহোসাইনী ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মোরশেদে আম শেখ হাসান আল হোদায়বী, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, জমিয়তে শাব্বানুল মুসলিমুনের সভাপতি মোহাম্মদ সানেহ তাফহীমুল কোরআন রচয়িতার মৃত্যুদন্ডের খবরের প্রতিবাদে সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান সরকারের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। সেই বার্তায় তারা উল্লেখ করেন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর মৃত্যুদন্ডের খবরে পাকিস্তানের প্রতি যাদের ভালবাসা রয়েছে তারা সবাই গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছেন। আমরা আশা করি পাকিস্তান সরকার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে এই আদেশ প্রত্যাহার করবেন। (আল আহরাম, কায়রো, ১৬ই মে, ১৯৫৩)

ইরাকের শিয়া নেতা মুজতাহেদে আযম মোহাম্মদ আলখালেসী, ইরাকের আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের আল্লামা আমজাদ জেহাদী, ইরাকের তৎকলীন প্রধানমন্ত্রী আমীর ফয়সল আযম, সউদী আরবের সুলতান ইবনে সউদ, ইরানের আল্লামা আয়াতুল্লাহ কাশানী ও ডক্টর মোসাদ্দেক, মিসরের জেনারেল নজীবকে জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। জওয়াবে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিম্নোক্ত তারবার্তা প্রেরণ করেনঃ 'মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর মৃত্যুদন্ডাদেশের খবর পেয়ে আমরা অবাক হয়েছি। অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আমরা আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা মনে করি এর ফলে মুসলিম বিশ্ব অস্থিরতা এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠবে।'

(আলমাজান, বাগদাদ, ১৫ই মে ১৯৫৩;)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআনঃ শুরুর আগে ও শেষের পরে

নঈম সিদ্দীকী

> *এই দরসে কোরআনে অংশগ্রহণকারীরা মাওলানাকে একখানি তাফসীর লেখার পরামর্শ দিলেন। মওলানা নিজেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তারপর তিনি কলম হাতে নিলেন। তরজুমানুল কোরআনে তাফসীরে তাফহীমুল কোরআনের প্রথম অংশ প্রকাশিত হলো।*

মাওলানা মওদূদীকে সবচেয়ে বেশী সময় কাছ থেকে যিনি দেখেছেন তার নাম নঈম সিদ্দিকী। মাওলানা যখন থেকে ইসলামী আন্দোলনের মহৎ কাজ শুরু করেছিলেন তখন থেকেই নঈম সিদ্দিকী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জনাব সিদ্দিকী সে সময় থাকতেন চকোয়ানের খানপুর গ্রামে। এটি একটি ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের সবুজ শ্যামল ফসলের ক্ষেতের আইলের ওপর বসে নঈম সিদ্দিকী হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত তরজুমানুল কোরআন এবং মাওলানার লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ করতেন। ১৯৪১ সালে পাঠানকোটের দারুল ইসলাম থেকে ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নঈম সিদ্দিকী তখনই খানপুরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

পাঠানকোটের দারুল ইসলামে মাওলানা মওদূদী ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করেন। সেখানে নিয়মিত দরসে কোরআনের মজলিস বসতো। নঈম সিদ্দিকী নিয়মিত সেসব মসলিসে যোগদান করতেন। এরপর এক সময় মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআন রচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং কাজ শুরু করেন। নঈম সিদ্দিকীর সামনেই এই কাজ শুরু হয়েছিল এবং তিনি জানতেন। ভারত বিভক্তির পর নতুন দেশে নতুন পরিবেশে এসে মাওলানা মওদূদী পুনরায়

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআন রচনায় মনোনিবেশ করেন। নঈম সিদ্দিকী মাওলানার সাথে জেলখানায়ও ছিলেন। সেখানেও তিনি মাওলানাকে তাফহীমুল কোরআন লিখতে দেখেছেন। একারণে তাঁর কাছে মাওলানার তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য হাযির হলাম। বললাম, কিভাবে এই তাফসীর গ্রন্থ রচনার চিন্তা মাওলানার মনে এলো?

নঈম সিদ্দিকী বললেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েই যায়। অন্য কথায় বলা যায় আল্লাহ পাক যদি কারো দ্বারা কোন কাজ করাতে চান, তবে তার মনে সেই কাজের প্রেরণা জাগিয়ে দেন। ভারত বিভক্তির আগে হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী মুসলিম জনগণের মধ্যে অস্থিরতার আগুন জ্বলছিল। তারা ইংরেজ এবং হিন্দুদের সুস্পষ্ট শত্রুতা থেকে মুক্তির কোন পথ পাচ্ছিল না। অস্থিরতা এবং হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। বহুমুখী রাজনৈতিক হুল্লোড়ের মধ্যে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তিও প্রমাণিত হচ্ছিল। ধর্মহীন গণতন্ত্র এবং বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী চেতনার মোকাবেলা বহু বিভক্ত ঘুণে ধরা ফ্যাকাসে দ্বীনদানী দ্বারা কিছুতেই করা যাচ্ছিল না। মাওলানার আহ্বানে অনেকে চমকে উঠলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলামমনস্ক যুবকরা ছুটে এলো। উদারমনা ওলামায়ে কেরাম সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। তাদের এলমে দ্বীনের পিপাসা জাগ্রত হলো। তারা ইসলামকে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিলেন। জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তারা কোরআনের যুগোপযোগী তরজমা ও তাফসীর চাচ্ছিলেন। কিন্তু কোথাও যাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের প্রত্যাশার তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে, সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরী হতে লাগলো তাফহীমুল কোরআন।

প্রশ্ন করলাম যে, নঈম সাহেব, আপনার কথা কিভাবে বুঝবো? দ্বীনী জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য উন্নত তরজমা ও তাফসীর তো পাওয়া যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ উৎকৃষ্ট তাফসীর ছিল আরবী ভাষায় রচিত। বিক্ষিপ্তভাবে কেউ কেউ আরবী ভাষা শেখার চেষ্টাও করছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারছিলেন না। আধুনিক চিন্তাধারা, যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব, চলমান জটিল জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নত একটি তাফসীরের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। মাওলানা মওদূদী

www.nagorikpathagar.org

সেই প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে এলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ঘড়ির আলাদা আলাদা পার্টস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সঠিক সময় জানা যাচ্ছিল না। মাওলানা মওদূদী সেসব পার্টস একত্রিত করে একটি নিখুঁত ঘড়ি তৈরী করলেন। সেই ঘড়ি সঠিক সময় দেয়ার উপযুক্ততা অর্জন করলো।

আমি বললাম, একটু যদি বুঝিয়ে বলতেন।

নঈম সিদ্দিকী বললেন, উর্দু সাহিত্যে দ্বীনের প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। নামায-রোযার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জ-যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও বিদ্যমান। জেহাদের গুরুত্ব এবং সওয়াব সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। অপরাধ, সাজা, সরকারী কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছুই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে। পৃথক পৃথকভাবে। সবকিছু একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ইসলাম যে একটি ধর্ম মাত্র নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান—এ কথা বলা হয়নি। তাফহীমুল কোরআনে সে কথা বলিষ্ঠ ভাষায় বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। ইসলামকে আধুনিক জীবন-পদ্ধতি এবং জীবন জিজ্ঞাসার সাথে একীভূত করে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিন্তার জগতে ইসলাম আলোড়ন এনে দিতে সক্ষম মাওলানা সেটা প্রমাণ করেছেন।

নঈম সাহেব, তাফহীমুল কোরআন রচনার সূচনা কিভাবে হয়েছিল?

তিনি বললেন, দরসে কোরআনের মাধ্যমে তাফহীমুল কোরআনের সূচনা হয়েছিল। পাঠনকোটের দারুল ইসলামে আসরের নামাযের পরে তাফসীরুল কোরআনের দরস হতো। মাওলানা মওদূদী ছিলেন বক্তা। এই মজলিস ছিল একটি নতুন এবং ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। আমার মতে সেই মজলিসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিতর্ক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে এমন খোলামেলা মতবিনিময় অনুষ্ঠান আমার জানা মতে অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মাওলানা মওদূদী প্রথমে আয়াত পাঠ করতেন, তারপর তরজমা করতেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতেন। তারপর আয়াতের ব্যাখ্যায় আকীদা-আখলাক, আইন-কানুন তথা হুকুম-আহকাম তুলে ধরতেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতে বর্ণিত বিষয়টির গুরুত্ব উপস্থাপন করতেন। আমরা মুগ্ধ হতাম। অভিভূত হতাম। মনে মনে ভাবলাম এরকম করে তো কখনো চিন্তা করিনি। আমার মনে যেসব প্রশ্ন জাগতো আমরা মাওলানাকে

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি জবাব দিতেন। শ্রোতাদের অধিকাংশ যুবক এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অনেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে এসেছে। তাদের মনে যেসব প্রশ্ন জাগতো অবলীলায় সেসব তারা প্রকাশ করতো। এভাবে দরসে কোরআন অনুষ্ঠান প্রতিদিনের কোরআন গবেষণা অনুষ্ঠানে পরিণত হলো। একদিকে ধর্মহীনতা, অন্যদিকে নাম-সর্বস্ব মুসলমানিত্ব, অন্যদিকে মযহাব-সর্বস্ব ধর্মপরায়ণতা সবার সামনে বিদ্যমান ছিল। পক্ষান্তরে পাঠানকোটের দারুল ইসলাম নামক স্থানে ইসলামের নতুন প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হচ্ছিল। ইসলাম একটি সামগ্রিক, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। ইসলামের পরশপাথর ক্রমেই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। চারিদিকে বিদ্যমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কোরআনকেন্দ্রিক বহুমুখী প্রশ্ন উচ্চারণ ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিক। মাওলানা মওদূদী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সে সব প্রশ্নের জবাব দিতেন।

আমি বললাম, নঈম সাহেব, এ ধরনের প্রশ্ন তো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা-মক্তবেও করা হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নঈম সিদ্দিকী বললেন, মাওলানার দারসে কোরআন মজলিসের প্রশ্নের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব প্রশ্ন শুধু মাসলা-মাসায়েল বিষয়ক ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল এমন মনমগজ তৈরী করা, যা ফেরকাবাজির সংকীর্ণ মীমাংসা থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মহীনতা, বস্তুতান্ত্রিকতা, মোনাফেকী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষতিকর আগ্রাসন মোকাবিলা করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, পাঠানকোটের দারুল ইসলামে ধর্মহীনতা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আমদানী করা ধ্বংসাত্মক সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি সংঘশক্তি গড়ে উঠছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা বহু সংখ্যক মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। বর্তমানে এই সংঘশক্তি শুধু পাকিস্তানে নয়, বরং বিশ্বের বহু স্থানে প্রসার লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তাফহীমুল কোরআন আমাদের হাতে একটি নির্ভরযোগ্য তীর।

আমি বললাম, মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধিতার কারণ কি? এই সভ্যতা তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে !

নঈম সিদ্দিকী বললেন, বিজ্ঞানের উন্নতি সমগ্র মানব জাতির সাফল্য। এর শুরু যদি হয়ে থাকে আগুনের আবিষ্কারের মাধ্যমে, তবে শেষ ধরা যায় মহাশূন্য অভিযান। যারা বলে যে, কোরআন বা ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী, তারা কেন এই

www.nagorikpathagar.org

সত্যটুকু স্বীকার করে না যে. কোরআন গবেষণার মাধ্যমে মুসলমানরা এক সময় বিজ্ঞানের সকল শাখায় উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেছে। যেখানে কোরআন পৌঁছেছে, সেখানেই বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে। কাজেই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে বিজ্ঞান-পূজারী ইউরোপকে মুসলমানরাই নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। কাজেই বিরোধিতার বিষয়বস্তু বিজ্ঞান নয়, বরং খোদাবিহীন নৈতিকতাবিবর্জিত উদ্দেশ্যহীন জীবন-দর্শন। এই দর্শন বিজ্ঞানের সহায়তায় পরগাছার মতো লালিত হচ্ছে। ধ্বংসাত্মক এই জীবন-দর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এমন অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে ঘৃণা ও সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এই দর্শনের কারণে মানুষ এবং চিরন্তন ও শাশ্বত মানবীয় সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিটি মানুষ নিজেকে ভাবছে নিঃসঙ্গ এবং একা। তারা সবাই অস্থিরতায় আক্রান্ত। এই সভ্যতায় আগ্রাসন বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এই সভ্যতার অপছায়া যেখানে পতিত হয়, সেখানে ইসলামের বিকাশ তো দূরের কথা বরং সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একারণে বর্তমানে সমগ্র মুসলিম জাহান এই সভ্যতার সাথে সংঘাতে লিপ্ত। মুসলিম সমাজে এই সভ্যতার প্রভাব এমন সর্বগ্রাসী ছিল যে, এর মদদগার ও পৃষ্ঠপোষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেছে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই সভ্যতার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। ইদানীং সেই সভ্যতার জাদুকরী প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। কোরআনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। নবী মোহাম্মদের (সঃ) পয়গামের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। সিদ্ধান্তমূলক এই পর্যায়ে সংকটের এই সন্ধিক্ষণে তাফহীমুল কোরআন এক মহান চিন্তাশক্তি হিসাবে আমাদের হাতে এসেছে। এই পবিত্র গ্রন্থ আমাদের যুব সমাজের মধ্যে খোদাভীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা সুদৃঢ় করেছে। তাফহীমুল কোরআন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক নতুন শক্তি সঞ্জীবনী গ্রন্থ।

নঈম সিদ্দিকী বললেন, মাওলানা মওদূদীর দরসে কোরআন অনুষ্ঠানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। স্থানীয় লোকজন, হিতৈষী শ্রেণী, ধর্ম-বিদ্বেষী শ্রেণী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন যুবক ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, ছাত্র-শিক্ষক, অল্প-শিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক শ্রমিক, নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষও অংশ

www.nagorikpathagar.org

নিতেন। এ ধরনের মজলিসে কতো রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হতে পারে সে কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায়। মাওলানা সাহেব সকলের প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এরপর প্রাঞ্জল বোধগম্য ভাষায় জবাব দিতেন। মাঝে মাঝে কোন বিষয়ে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হতো। আমাদের মতো অনুসন্ধিৎসু মনের যুবকেরা এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করতাম যেসব প্রশ্নের জবাব প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষকের পক্ষেই দেয়া সম্ভব ছিল না। মনে পড়ে, একবার মাওলানা বিশেষ কারণে কয়েক দিন অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দরসে কোরআনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু প্রশ্নবাণে তিনি জর্জরিত হয়ে কখনো ধমক দিয়ে প্রশ্নকারীকে থামিয়ে দিচ্ছিলেন, আবার কখনো হাসিমুখে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছিলেন। আমরা সেই সময় স্পষ্ট উপলব্ধি করছিলাম যে, মাওলানা মওদূদী এক খোদা প্রদত্ত প্রতিভা এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ নেয়ামত। এই দরসে কোরআনে অংশগ্রহণকারীরা মাওলানাকে একখানি তাফসীর লেখার পরামর্শ দিলেন। মওলানা নিজেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তারপর তিনি কলম হাতে নিলেন। তরজুমানুল কোরআনে তাফসীরে তাফহীমুল কোরআনের প্রথম অংশ প্রকাশিত হলো। তাফসীর লেখার শুরুতেই মূল আয়াত কিভাবে সাজাবেন, তরজমা কিভাবে কোথায় সন্নিবেশিত করবেন, তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিভাবে সংযুক্ত করবেন এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ নেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রথমে আয়াত, তার নীচে তরজমা, তার নীচে তাফসীর সংযুক্ত করা হবে।

নঈম সিদ্দিকীকে এ পর্যায়ে প্রশ্ন করলাম যে, খতমে নবুয়ত ও হাদীস অস্বীকারকারীরা মাওলানার এতো বিরোধিতা করে কেন, এর কারণ কি?

নঈম সিদ্দিকী বললেন, তাফহীমুল কোরআনের মতো গ্রন্থ প্রণীত হওয়ার পর নিজেই সে জায়গা করে নেয়। মানব হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। চিন্তা চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাফহীমুল কোরআনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল দিক ও বিভাগের উপকরণ রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নাগরিক জীবন, ইতিহাস, নৈতিকতা, মনস্তত্ত্ব, জাতিগত জ্ঞান, নবীদের কাহিনী, সীরাতে রসূলে মোস্তফা (সঃ) ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক তথ্য রয়েছে। এতো কিছুর সন্নিবেশ যে গ্রন্থে ঘটানো হয়েছে, সেই গ্রন্থকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব

www.nagorikpathagar.org

নয়। ভবিষ্যতে বহু দেশে এই গ্রন্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হবে, পিএইচডি থিসিসের বিষয় হবে এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। তাফহীমুল কোরআনে যেসব দুষ্প্রাপ্য অমূল্য রেফারেন্স রয়েছে, সেসব আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করবে। জুমার খোতবায় তাফহীমুল কোরআনের ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে। বক্তৃতায় ভাষণে এই গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেয়া হবে। লেখকদের লেখার তথ্য এই গ্রন্থ থেকে নেয়া হবে। পাকিস্তানে অথবা বিশ্বের অন্য কোন দেশে যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তাফহীমুল কোরআন সেই দেশের ইসলামী বিপ্লবের গাইডবুক হিসাবে বিবেচিত হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ কোরআন-সুন্নাহর আলো দেখাতে থাকবে। আমি বললাম, নঈম সাহেব, আপনি বলেছেন যে, তাফহীমুল কোরআনে রকমারি তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। পৃথকভাবে সেসব তথ্য বিষয়ভিত্তিক ভাবে সংকলন করা সম্ভব বলে কি আপনি মনে করেন?

নঈম সিদ্দিকী বললেন, সেতো অবশ্যই। ভবিষ্যতের জন্য তো অনেক কিছুই চিন্তা করা যায়। আমি বলছি বর্তমানের কথা। বর্তমানে তাফহীমুল কোরআনের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আমি নিজেই গ্রন্থ রচনা করছি। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আমি এই কাজ আনজাম দিচ্ছি। বিশেষত সীরাতুন্নবীর ওপর একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। চার খন্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হবে। মাওলানা মওদূদী নিজেই এই গ্রন্থ দেখে দিয়েছেন। সর্বাগ্রে আমিই অবশ্য এই বিষয়ে গ্রন্থ সংকলনের বিষয়টি তাঁর নজরে এনেছিলাম। তিনি তা অনুমোদন করেন। এছাড়া ইহুদীবাদ এবং খৃস্টবাদের ওপর দুটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইহুদীবাদ সম্পর্কে প্রায় আটশত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। খৃস্টবাদ সম্পর্কে গ্রন্থটি রচনার কাজ চলছে। এছাড়া তাফহীমুল কোরআন এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাওলানা যেসব হাদীস ব্যবহার করেছেন সেসব হাদীস একত্রিত করে যুগোপযোগী শিরোনাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। কোরআনের অভিধান নামে অন্য একটি গ্রন্থ রচনার কাজও সম্পন্ন করা হবে। ১৯৬৯ সালে সীরাত গ্রন্থ রচনা ছাড়াও উপরোক্ত গ্রন্থাবলী প্রণয়নের পরিকল্পনা মাওলানার নিকট পেশ করা হয়েছিল। তিনি সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শও বিভিন্ন সময় দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

নঈম সিদ্দিকীকে প্রশ্ন করা হলো যে, মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে অন্যদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিতেন কিনা ?

নঈম সিদ্দিকী বললেন, অবশ্যই দিতেন। বহু উদাহরণ রয়েছে। প্রতিদিন ডাকে যেসব চিঠি আসতো, সেসব চিঠিতে নানা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা এবং সমালোচনা থাকতো। মাওলানা মওদূদী সেসবকে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর তাফসীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতেন।

শেষ প্রশ্ন করলাম যে, আপনি তো জেলখানায়ও মাওলানা মওদূদীর সাথে ছিলেন। তিনি সেখানে তাফহীমুল কোরআনের কাজ কিভাবে করতেন?

নঈম সিদ্দিকী বললেন, ১৯৬৪ সালে মাওলানা গ্রেফতার হন, সেই সময়ে আমিও গ্রেফতার হই। লাহোর ডিস্ট্রিক্ট জেলে মাওলানা এবং আমাকে পাশাপাশি কামরায় রাখা হয়েছিল। সকালে নামাযের পর নাশতার সময় মাওলানার সাথে দেখা হতো। নাশতার পর আমরা খবরের কাগজ পড়তাম। খবরের কাগজ পড়ার পর মাওলানা তাঁর কামরায় লিখতে বসতেন। প্রয়োজনীয় রেফারেন্স গ্রন্থ সংগ্রহ করার পর মাওলানা তাফসীর লেখার কাজে হাত দেন। জেলে আসার আগে যেভাবে লিখতেন, সেই একই নিয়মে লিখতে থাকেন। মাওলানা কয়েক ঘন্টা লাগাতার লিখতেন। এ সময়ে আমরা তাঁকে বিরক্ত করতাম না। কখনো কখনো সকাল ১১ টায় চায়ের আসরে আমরা মাওলানাকে উপস্থিত করতে সক্ষম হতাম। চা পানের পর মাওলানা একাধারে যোহরের সময় পর্যন্ত লিখতেন। জেলখানায় এবং জেলখানার বাইরে একই নিয়মে অবিরাম পরিশ্রমের ফসল তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন।

তাফহীমুল কোরআন এবং তার রচয়িতা সম্পর্কে বহু তথ্য নঈম সিদ্দিকী আমাকে জানালেন।

লাহোরের সাপ্তাহিক 'আইন' পত্রিকার জন্যে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন-বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আবেদ নিযামী।

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআন একটি বড় নেয়ামত

খাদিজা আখতার রেজায়ী

তাফহীম লেখা চলতে থাকে। শেষে ত্রিশ বছরের অবিরাম চেষ্টার পর ছয় খন্ডে তাফসীরটি সমাপ্ত হয়। পুরা কেতাব বড় সাইজের চার হাজার একশ' তিহাত্তর পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। কিন্তু মূল বিষয় এখানে কেতাবের বৃহত্ব নয়, বরং তার অনুপম বৈশিষ্টসমূহ।

কোরআন শরীফের হাজারো তাফসীর ও হাজারো তরজমা হয়েছে। এসব তাফসীর ও সমুদয় তরজমা নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ সময়ে অবশ্যই মূল্যবান তরজমা ও তাফসীর ছিল। এসব তরজমা ও তাফসীরের উপকারিতা পূর্বে যেরূপ ছিল আজও তেমনি আছে। কিন্তু এর কিছু তাফসীর সাধারণ শিক্ষিতদের কোনো কাজে আসে না। এগুলো দ্বারা আলেম সমাজই উপকার লাভ করতে পারেন। তাছাড়া অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও এসব তরজমা ও তাফসীরের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি আছে। এসব তরজমার মধ্যে ঘাটতি হচ্ছে এই যে, এগুলো পাঠ করলে কোরআনের প্রাণ ও মূলমন্ত্র পর্যন্ত পৌছা সহজ হয় না। এগুলো দ্বারা কোরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝার ক্ষেত্রেও সেরূপ সাহায্য লাভ করা যায় না, যেরূপ আধুনিক মন-মানসিকতার জন্য দরকার।

এদিকে আমাদের সময়ে লোকদের মধ্যে কোরআনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার মৌল দাবী জানার এক পিপাসা সৃষ্টি হয়েছে। মাওলানা মওদূদী এই চাহিদা অনুভব করেন। সাথে সাথে এটাও অনুভব করেন যে, তিনি এ খেদমত

www.nagorikpathagar.org

আঞ্জাম দিতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাফহীমুল কোরআন লেখার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এই নেক কাজটি তিনি শুরু করেন। কিন্তু এর সাথে সাথে আরো অনেক কাজ ছিল—যাতে মাওলানার মনোযোগ ও সময় ব্যয় হতো। তিনি জামায়াতে ইসলামী গঠন করেছিলেন। এ জামায়াতের কাজ অগ্রসর করার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান তাঁরই দায়িত্বে ছিল। তিনিই জামায়াতের আমীর ছিলেন। এছাড়া সংগঠনের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁকে আরো বহু বই-পুস্তক লিখতে হতো। তাই কাজের গতি বেশী তীক্ষ্ণ হতে পারেনি। এসব ব্যস্ততা ছাড়া বিপদ ও পরীক্ষার সময়ও এসেছে। যাতে মাওলানাকে বারবার জেলে রাখা হয়েছে। মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। বিদ্রোহ, অরাজকতা সৃষ্টির ভিত্তিহীন অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এসব পরীক্ষায় সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হন। নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাফহীম লেখা চলতে থাকে। শেষে ত্রিশ বছরের অবিরাম চেষ্টার পর ছয় খন্ডে তাফসীরটি সমাপ্ত হয়। পুরা কেতাব বড় সাইজের চার হাজার একশ' তিহাত্তর (৪১৭৩) পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। কিন্তু মূল বিষয় এখানে কেতাবের বৃহত্ব নয়, বরং তার বৈশিষ্টসমূহ। যা এই তাফসীরকে দুনিয়ার বর্তমান তাফসীরসমূহের মধ্যে একটি উত্তম তাফসীর বানিয়ে দিয়েছে। একটু আগেই বলা হয়েছে যে, এ তাফসীর আলেম ও মোহাক্কেকদের জন্য লেখা হয়নি, বরং এ কেতাব আধুনিক শিক্ষিত নব্য সমাজকে কোরআনের প্রাণ ও মূলতত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য লেখা হয়েছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে মাওলানা দুটি দিকের ওপর বিশেষ নযর দেন।

প্রথমত তিনি কোরআনের উর্দু তরজমা করার সময় কোরআনের সাহিত্যিক ভাব এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, কোরআন পড়ার সময় আরবী জানা লোক যে স্বাদ অনুভব করে, তার মনে যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে যে চিত্র অংকিত হয় এবং তার আত্মার মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব উর্দু জানা লোকও এই তরজমা পড়ে অনুভব করবে। যাতে পাঠক এটা বুঝতে পারে যে, কোরআনের ভাষায় এমন কি জাদু ছিল যে, উতবার মতো কাফের ব্যক্তি তার কয়েকটি আয়াত শুনেই অস্থির হয়ে পড়লো এবং সে নবী (সঃ)-এর মুখের ওপর হাত রেখে বললো, 'মোহাম্মদ থামো! এরূপ কথা মুখ দিয়ে বের করো না। তাহলে তোমার কউমের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে।' কিংবা কি কারণ ছিল

www.nagorikpathagar.org

যে, কোরআনের কয়েকটি বাণী শুনেই হাবশার পরাক্রমশালী সম্রাট জমজমাট দরবারে কেঁদে ফেলেন এবং নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'আল্লাহ্‌র কসম! হযরত ঈসা মসীহ্‌র মর্যাদা কোরআনে বর্ণিত এই সত্য অপেক্ষা তিল পরিমাণও বেশী ছিল না।' অথবা কি কারণ ছিল যে, হযরত ওমরের মতো ইসলামের দুশমন তার বোনের নিকট থেকে কোরআনের একটি সূরা নিয়ে পাঠ করার পর মোমের মতো নরম হয়ে রসূলুল্লাহ্‌র কালেমা পাঠ করেন।'

বস্তুত মাওলানা তাঁর এই লক্ষ্য হাসিলে সফল হয়েছেন। অবশ্য এ কাজের জন্য তাঁকে তরজমার স্থলে 'তরজুমানী' তথা ভাবানুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের ভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে এটা সবাই জানেন যে, এক ভাষার বিষয়বস্তু অন্য ভাষায় রূপান্তর করতে হলে এ ছাড়া অন্য কোনো পথও নেই। অর্থাৎ তরজমাও হবে এবং সেই মর্ম ও প্রভাব পাঠক মনে সৃষ্টি হবে, যা মূল বস্তু পড়ার দ্বারা ভাষাভাষীর অন্তরে সৃষ্টি হয়। তার একমাত্র পদ্ধতি এটাই হতে পারে যা মাওলানা গ্রহণ করেছেন। মূলত এটি সহজ কাজ নয়। মাওলানার সাহসের প্রশংসা করতে হয় যে, তিনি এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়েছেন এবং 'আরবী মুবীন' *(সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী আরবী)*কে 'উর্দু মুবীন' *(সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী উর্দু)* এ রূপান্তরিত করেছেন। সত্য কথা এই যে, তিনি তরজুমানীর হক আদায় করেছেন। তাঁর তরজুমানী পাঠ করার পর কোরআনের সাহিত্যিক মোজেযার এক মৃদু রশ্মি উর্দু পাঠকারী পাঠকের মনে প্রতিবিম্বিত হয়।

তাফহীমুল কোরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে তার পাদটীকা। এই পাদটীকা আধুনিক শিক্ষিতদের লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে। এতে মাওলানা শব্দ নিয়ে বেশী আলোচনা করেননি। বরং বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর কোরআনী সমাধান পেশ করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন কোরআন পড়ার সময় পাঠকের যেখানে যেখানে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে সেখানে সে বিষয়টি আলোকপাত করতে। যেখানে যেখানে তার মনে প্রশ্নের উদ্ভব হবে, সেখানে সেখানে তার জওয়াব দিতে। এ বিষয়ে মাওলানা আরেকটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পাদটীকায় ওলামা ও ফেকাহ্‌বিদদের সেই সব অভিমত লিখে দিয়েছেন, পরবর্তীতে যা মাযহাবী ইখতেলাফের কারণ হয়েছে। মাওলানা বিভিন্ন মাযহাবী অভিমত তুলে ধরে নব্য শিক্ষিতদের এই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন যে, তারা কোরআনের কোনো বিশেষ আয়াতের আলোকে কতটুকু আযাদী ভোগ

www.nagorikpathagar.org

করবে এবং কতটুকু পাবন্দী তাদের মনে চলতে হবে। আপন এই বৈশিষ্টের কারণে তাফহীমুল কোরআন বিশ্ব-মুসলমানদের জন্য একটি উপকারী গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এখন এর দ্বারা সব মাযহাবের পাঠক উপকৃত হতে পারেন এবং সেই সব কারণ বুঝতে পারেন যার দরুন মাযহাবী পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সে ইজতেহাদী আলো লাভ করে। সে উপলব্ধি করে যে, একটি মাযহাব কেনো গ্রহণ করবে এবং অন্যটিকে কেনো পরিত্যাগ করবে। আপন এই বৈশিষ্টে তাফহীমুল কোরআন সম্পূর্ণ একক মর্যাদার অধিকারী।

এসব বৈশিষ্ট ছাড়াও তাফহীমুল কোরআনে আরো কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, যা অন্যান্য তাফসীরে অনুপস্থিত। যেমনঃ

মাওলানা প্রত্যেক সূরার শুরুতে একটি ভূমিকা দিয়েছেন। যা সূরার নাম, শানে নুযুল, তার কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও তার সাধারণ আলোচ্য বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এতে পাঠকের জন্য এটা সহজ হয় যে, পূর্ণ সূরাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে সে তার মর্ম ও উদ্দেশ্যকে মোটামুটিভাবে জেনে নেয়। অতপর যখন সে সূরাটি পাঠ করে তার ভাবার্থ ও ব্যাখ্যামূলক টীকা পাঠ করে, তখন তার মনে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। কোরআনের পূর্ণ আহ্বান তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাই বুঝতে পারছে, যা কোরআন তাকে বুঝাতে চাচ্ছে। সে বুঝতে পারে যে, কোরআন একটি বিশ্বজনীন আহ্বানের আহবায়ক। এটি গতানুগতিক অর্থে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এ হচ্ছে একটি জীবন ব্যবস্থা প্রণয়নের 'মেনিফেস্টো'। যার ওপর আমল করে আমরা সেই ঈপ্সিত পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো, যে পর্যন্ত কোরআন আমাদের পৌঁছাতে চায়। এ সত্যটি সুস্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মাওলানার সেই একনিষ্ঠতারও হাত রয়েছে, যা ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী, একজন পরামর্শদাতা ও একজন নেতা হিসাবে তাঁর কর্মকান্ডে পরিস্ফুট। মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনে সেই কাজই করছেন, যা কোরআন চায় যে, সব মুসলমান করুক। মাওলানা সেই জীবন ব্যবস্থা আনয়নের অনবরত ও অনলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, যা ইসলাম আনয়নকারী নিজে করেছিলেন। সম্ভবত একারণেই তাফহীমুল কোরআনে কোরআনের প্রাণ ও মূলতত্ত্ব পূর্ণভাবে সঞ্চিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকটি সূরার ভূমিকা ছাড়া মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআনের সামগ্রিক একটি ভূমিকাও লিখেছেন। তাতে তিনি কোরআনের আলোচ্য বিষয়, বক্তব্য ও বর্ণনা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটা প্রয়োজন ছিল। কেননা, কোরআনের পদ্ধতি দুনিয়ার তামাম কেতাব থেকে আলাদা। তার নিজস্ব একটি পদ্ধতি আছে। সাধারণত আমরা যেসব বই-পুস্তক পড়ি, তাতে এক বিশেষ বিন্যাসসহ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনা থাকে। কিন্তু কোরআনে এরূপ নেই। এখানে আকীদা, হেদায়াত, শরীয়তের বিধান, দাওয়াত, নসীহত, সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন, ঐতিহাসিক কাহিনী, মনস্তাত্ত্বিক রহস্য, বিশ্ব-নিদর্শনসমূহ ও যুক্তি-প্রমাণ—সব এক সাথে আসছে। কোথাও কোথাও একই বিষয় বারবার পুনরাবৃত্ত করা হচ্ছে। কখনো এক বিষয়ের মধ্যে অন্য বিষয় এসে গেছে। কখনো একজনে কথা বলছে, কখনো অন্য জনে। মোট কথা, মানুষের নির্ধারিত প্রকাশনা-পদ্ধতির সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। এতে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত এ কেতাবের আলোচ্য বিষয় আসলে কি? এটা কি ধরনের কেতাব যে, এতে কোনো বিন্যাস বা বিষয়-নির্দেশই নেই! তারপর সে যখন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে এই কেতাব পাঠ করে, তখন তাকে মনে হয় যেনো সে একজন বিভ্রান্ত পথিক। এরূপ মানসিক অবস্থা নিয়ে কোরআন পাঠকারী কোরআনের কি বুঝবে?

মাওলানা তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় এ বিষয়টিই পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কোরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-

'বিশ্ব-প্রতিপালক, যিনি সারা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা, মালিক ও বিধানদাতা। তাঁর সীমাহীন সাম্রাজ্যের একটি অংশে—যাকে যমীন বলা হয়—মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে জানার, বুঝার এবং চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ভালো-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন। নির্বাচন ও ইচ্ছার আযাদী দিয়েছেন। আয়-ব্যয় ও লেন-দেনের ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং মোটামুটি এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে তাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন।'

অতপর কোরআন বলছে যে, আল্লাহ মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, 'দুনিয়ার এই জীবন—যেখানে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে মূলত একটি পরীক্ষার মুদ্দত, যার পর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আর আমি তোমাদের কাজ যাচাই-বাছাই করে দেখবো যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে এই

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে এবং কে হয়েছে ব্যর্থকাম। তোমাদের সঠিক কাজ হচ্ছে—আমাকে তোমাদের একক মাবুদ ও হুকুমদাতা মেনে নাও। যে পথ-নির্দেশ আমি পাঠাই, সেই অনুযায়ী দুনিয়ায় কাজ করো এবং দুনিয়াকে পরীক্ষা-ক্ষেত্র মনে করে এ বোধসহ জীবন যাপন করো যে, তোমাদের মূল লক্ষ্য আমার শেষ ফয়সালায় কামিয়াব হওয়া। এর বিপরীত তোমরা যে পথই গ্রহণ করো না কেনো, তা ভুল। যদি প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করো (যা অবলম্বন করার তোমার স্বাধীনতা রয়েছে) তবে তোমাদের দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে এবং যখন আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন আমি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশের এমন আবাস দান করবো—যার নাম হচ্ছে জান্নাত। আর যদি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করো (যে পথে চলার জন্যও তোমাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে), তবে দুনিয়ায় তোমাদেরকে বিপর্যয় ও অস্বস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর দুনিয়া পার হয়ে পরজগতে আসার পর চির দুঃখ ও বিপদের সেই গর্তে নিক্ষেপ করা হবে—যার নাম হচ্ছে জাহান্নাম।'

আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মানব জাতির জীবনের সূচনা করেছেন পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। এটাকেই তাদের জীবন ব্যবস্থা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের জীবন-পদ্ধতি ছিল আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তারা তাদের সন্তানদের শিখিয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) হিসাবে বসবাস করবে। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ এই সঠিক জীবন-পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বিভিন্ন রকম পথ ধরে চলতে লাগলো। তারা অবহেলা করে তা হারিয়ে ফেললো এবং অনাচার সৃষ্টি করে তাকে বিকৃতও করলো।

'আল্লাহ যে সীমিত স্বাধীনতা মানুষকে দান করেছিলেন, তার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিগত হস্তক্ষেপ করে ঐসব বিপথগামী মানুষকে জোর করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। আর তিনি দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যে সময় মানব জাতির জন্য এবং তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন তার সাথে এটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না যে, এই বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়ার সাথে সাথেই তিনি মানুষদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তাছাড়া, যে কাজটি সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে তিনি তাঁর দায়িত্বে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতা বহাল রেখে তার কর্মকালের মধ্যে তাকে পথ-

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেয়া। সুতরাং এই স্ব-আরোপিত দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি মানুষের মধ্য থেকেই এমন ব্যক্তিদের ব্যবহার করা শুরু করেন, যারা তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণকারী ছিলেন।' তাদেরকে পয়গাম্বর বলা হয়।

'এই পয়গাম্বর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হতে থাকেন। এদের সবার একই দ্বীন ছিল। ...... তাঁরা সবাই একই পথ-নির্দেশের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁদের সবার এই একই মিশন ছিল যে, এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে তাঁদের সকল শ্রেণীকে দাওয়াত দেবেন। অতপর যারা এই দাওয়াত কবুল করবে, তাদের সংগঠিত করে এমন একটি উম্মত বানাবেন—যারা নিজেরা আল্লাহর কানুনের পাবন্দ হবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করা ও এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ রোধ করার জন্য সংগ্রাম করবে।' সবশেষে আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সেই কাজের অন্য প্রেরণ করেন, যে জন্য অতীতের নবীগণ আসতে থাকেন। তার সম্বোধিত ছিল সাধারণ মানুষ এবং অতীত নবীদের পথভ্রষ্ট অনুসারীরাও। সবাইকে সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেয়া, সবার কাছে নতুনভাবে আল্লাহর হেদায়াত পৌছে দেয়া এবং যারা এই দাওয়াত ও হেদায়াত কবুল করবে, তাদেরকে এমন একটি উম্মত বানিয়ে দেয়া তাঁর কাজ ছিল, যারা একদিকে স্বয়ং নিজেদের জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর পথ-নির্দেশের ওপর কায়েম করবে এবং অপরদিকে দুনিয়ার মানুষকে সংশোধন করার সুপ্রয়াস পাবে। সেই দাওয়াত ও হেদায়াতেরই কেতাব হচ্ছে এই কোরআন। যা আল্লাহ মোহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর নাযিল করেছেন।' এই কেতাবের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। তার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে ইসলাম এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সেই সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেয়া, যাকে মানুষ আপন গাফলতের দ্বারা হারিয়ে ফেলেছে এবং আপন অনাচার দ্বারা বিকৃত করে ফেলেছে। এ হচ্ছে কোরআনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষ তা মানুক বা না মানুক। কিন্তু সে যদি তাকে মানতে চায়, তবে তাকে তা পুরাপুরিভাবে মানতে হবে। এটা সম্ভব নয় যে, তার কিছু অংশ মানবে এবং কিছু অংশ মানবে না। কেউ যদি এরূপ করে, তবে সে যেনো সম্পূর্ণটাকেই অস্বীকার করছে।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন শরীফের মূল লক্ষ্য বর্ণনা করার পর মাওলানা মওদূদী এই ভূমিকায় কোরআনের বর্ণনা-পদ্ধতি, তার বিন্যাস এবং তার আলোচ্য বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেছেন এবং বলেছেন যে, কোরআনে না কোনো পুস্তকী বিন্যাস আছে, না আছে কোনো কেতাবী পদ্ধতি। এই অবিন্যাসটাই হচ্ছে তার 'বিন্যাস' এবং তার এই অপদ্ধতিই হচ্ছে 'উত্তম পদ্ধতি'। তার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পয়গাম্বরীর জন্য নির্বাচন করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম প্রথমে তাঁর নিজ গোত্রে পৌঁছাবেন, তারপর এই দাওয়াতের চৌহদ্দি বাড়াতে থাকবেন।

দাওয়াতের এই স্তরে তিন প্রকার হেদায়াতের প্রয়োজন ছিল। (১) পয়গাম্বরের নিজ প্রস্তুতির জন্য পথ নির্দেশসমূহ। (২) দ্বীন সম্পর্কে সেই সব ভুল ধারণার অপনোদন যা আশপাশের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং (৩) সঠিক দ্বীনের দিকে দাওয়াত।

এই স্তরে আল্লাহ প্রভাবকারী সুমিষ্ট বুলি দিয়ে মনে লাগার মতো আয়াতসমূহ নাযিল করেন—যেগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক রূপ ছিল খুব বেশী। যাতে শ্রবণকারীরা কথা দ্বারা হৃদয়গ্রাহী প্রভাব গ্রহণ করতে পারে। এ ধারা চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এর ফলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গেলো। কিছু লোক দাওয়াতের চর্চা করতে লাগলো এবং অন্য কিছু লোক দাওয়াতের বিরোধিতা শুরু করলো। দাওয়াত যতই বাড়তে লাগলো, বিরোধিতাও ততই তীব্র হলো। দাওয়াত গ্রহণকারী ও অগ্রহণকারীদের মধ্যে শুরু হলো দ্বন্দ্ব।

এ স্তরে প্রয়োজন ছিল মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা। যাতে তাদের মধ্যে বিরোধীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার সাহস সঞ্চারিত হয়। তাই তখনকার আয়াতসমূহের মধ্যে নদীর মতো স্রোত এবং আগুনের মতো উত্তেজনা দেখা যায়। পক্ষান্তরে দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি-প্রদর্শনকারী এমন সব আয়াত নাযিল করা হলো, যার দ্বারা তাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় সৃষ্টি হয় এবং তাদের মন নরম হয়।

মক্কার তেরো বছরের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর যখন তাদের একটি ঠিকানা মিলে গেলো এবং সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়ে মদীনা পৌঁছে গেলেন, তখন আরেকটি স্তর তাদের সামনে এলো। এ স্তর ছিল সমাজ সংগঠন ও শাসন ব্যবস্থার। এ স্তরে পুরানো জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের সাথে সশস্ত্র

www.nagorikpathagar.org

মোকাবেলাও হলো এবং সন্ধিচুক্তিও। সুতরাং এ স্তরে যে কোরআনী পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, তার মধ্যে কিছু বিধি-বিধান আছে, কিছু উপদেশ আছে, কিছু সমবেদনা আছে, কিছু অনুশাসন আছে। মোট কথা, আন্দোলনের প্রতিটি স্তরের এর জন্য কার্যক্রম রয়েছে এবং কর্ম-শক্তি সঞ্চয় করার জন্য উপায়-উপকরণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিষয়গুলোর দিকে ইশারা করে মাওলানা বলেন যে, কোরআন কোনো লেকচারারের লেকচারের সমষ্টি নয়। বরং এটি একটি আন্দোলনের নেতার ভাষণের মতো। যাকে নানা রংগের মানুষ, নানান ধরনের অবস্থা ও নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর দ্বারা একথাটিও বুঝতে পারা যায় যে, কোরআনে আলোচ্য বিষয়সমূহের পুনরাবৃত্তি কেনো হয়েছে।

এ বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোরআনের বিন্যাস সেই অবস্থায় কেনো নেই, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। কোরআনের বর্তমান বিন্যাস হচ্ছে সেরূপ, যা দাওয়াত পরবর্তী অবস্থার উপযুক্ত। যেভাবে নাযিল হয়েছে যদি তাকে সেভাবে সংকলন করা হতো, তাহলে প্রতিটি আয়াত ও প্রতিটি সূরার শানে নুযুল ও ইতিহাসও তার সাথে লিখে দেয়া আবশ্যক হতো। যদি এরূপ করা হতো, তবে এ কেতাব পরিণত হতো একটি ইতিহাস গ্রন্থে একটি আন্দোলনের ইশতেহার ও সংবিধান তা কখনোই হতে পারতো না। কোরআনের বিন্যাস পরবর্তী লোকেরা করেছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং এ বিন্যাস কোরআন নাযিলকারীর নির্দেশ অনুসারেই হয়েছে এবং সম্পূর্ণ সেভাবেই হয়েছে যে, ভাবে নবী (সঃ) তাঁর জীবনদ্দশায় করে দিয়েছিলেন।

যেসব হেকমত ও গূঢ় রহস্যের কারণে কোআনের বর্তমান বিন্যাস সর্বদিক দিয়ে দার্শনিকসুলভ একটি কাজ বলে সাব্যস্ত হচ্ছে মাওলানা মওদূদী তাঁর এই ভূমিকায় তার সবগুলোই উল্লেখ করেছেন, এরপর তিনি অধ্যয়ন-পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করেছেন, যা অনুসরণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোরআন থেকে পুরাপুরি ফায়দা হাসিল করতে পারবে না।

এই সব বৈশিষ্টই তাফহীমুল কোরআনকে এযুগের সবচেয়ে উত্তম ও সহজবোধ্য তাফসীরে পরিণত করেছে।

রামপুর (ভারত) থেকে প্রকাশিত 'আল হাসানাত' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে

www.nagorikpathagar.org

আমার প্রিয় গ্রন্থ আল কোরআন

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

> *ইংরেজীতে এ চাবিকে বলা হয় 'মাস্টার কী' বা আসল চাবি। যা দ্বারা সব তালাই খোলা যায়। আমার জন্য এই কোরআনই হচ্ছে আসল চাবি। জীবন-সমস্যার যে তালায় মধ্যেই তাকে ব্যবহার করছি, তা সহজেই খুলে যাচ্ছে।*

ভারত বিভাগের পূর্বের কথা। 'আন-নাদওয়া' পত্রিকা 'আমার প্রিয় গ্রন্থসমূহ' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক বিষয় প্রকাশ করতে শুরু করলো। এই শিরোনামে যারা নিজেদের চিন্তাধারা পেশ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা ই'যায আলী—শায়খুল ফিকহ ওয়াল আদব দারুল উলুম দেওবন্দ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নাদভী, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আবদুল বারী নাদভী—প্রফেসর জামেয়া উছমানিয়া, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গীলানী, মিয়া বাশীর আহমদ বি,এ (অক্সফোর্ড)—'হুমায়ুন' পত্রিকার সম্পাদক, মিয়া বদরুদ্দীন আলূভী—প্রফেসর মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, মাওলানা সাইয়েদ তালহা—প্রফেসর ওরিয়েটাল কলেজ, লাহোর, মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী—সম্পাদক, 'বুরহান', দিল্লী, প্রফেসর নওয়াব আলী—প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী জুনাগড়, মাওলানা শাহ হালীম আতা—উস্তাদ তাফসীর ও হাদীস, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আবদুল আযীয মায়মান—প্রফেসর মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, মাওলানা আবদুস সালাম নাদভী, খাজা গোলাম সাইয়েদায়ন—শিক্ষামন্ত্রী রামপুর, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী এবং মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী। এরাঁ সবাই নিজেদের মূল্যবান মন্তব্য লিখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কিছুকাল পরে ১৯৪৬ সালের মে মাসে যখন মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান নাদভী এই মূল্যবান লেখাগুলো একত্রিত করে 'মাশাহীরে আহলে ইলম কী মুহসেন কেতাবেঁ' (খ্যাতনামা আলেমদের প্রিয় গ্রন্থসমূহ নামে) মাআরিফ প্রেস, আযমগড় থেকে গ্রন্থাকরে প্রকাশ করলেন, তখন তাতে মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদীর সেই লেখাটিও সন্নিবেশিত করলেন, যা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ছাপা যায়নি। সাধারণভাবে লেখকরা একাধিক গ্রন্থকে তাদের প্রিয় গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী তাঁর কয়েক লাইনের সংক্ষিপ্ত লেখায় মাত্র একটি গ্রন্থকে তাঁর প্রিয় গ্রন্থ সাব্যস্ত করেন। তাই মাওলানা মওদূদীর লেখাটি 'আমার প্রিয় গ্রন্থসমূহ'-এর স্থলে 'আমার প্রিয় গ্রন্থ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নীচে তাঁর লেখাটি উদ্‌ধৃত করা হলোঃ

'জাহেলিয়াত যুগে আমি অনেক কিছু পড়েছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমি মোটামুটি একটি পাঠাগার আমার দেমাগে প্রবেশ করিয়েছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কোরআন পাঠ করলাম, তখন আল্লাহর কসম, আমার মনে হলো এ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছি তা সবই নগণ্য। এলমের শিকড় এখন হস্তগত হয়েছে। কান্ট, হেগেল, নিটশে, মার্ক্স এবং দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাবিদদের সবাইকে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এক একটি শিশু। এই বেচারাদের ওপর আমার করুণা হচ্ছে। সারা জীবন যে সমস্যা সমাধানের জন্য তারা তৎপর ছিল এবং যেসব বিষয়ে তারা বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছে তারপরও সমাধান করতে পারেনি, সে বিষয়গুলোকে এই গ্রন্থটি এক-এক, দুই-দুই বাক্যে সমাধান করে দিয়েছে। এটিই আমার প্রিয় গ্রন্থ। এটি আমাকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে। বলতে গেলে জানোয়ার থেকে মানুষে পরিণত করেছে। অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসেছে। এমন বাতি আমার হাতে তুলে দিয়েছে যে, জীবনের যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তার গূঢ় রহস্য এরূপ উন্মোচিত হয়ে যায় যেনো তার ওপর কোনো আবরণই নেই। ইংরেজীতে এ চাবিকে বলা হয় 'মাস্টার কি' আসল চাবি। যা দ্বারা সব তালাই খোলা যায়। আমার জন্য এই কোরআনই হচ্ছে আসল চাবি। জীবন-সমস্যার যে তালার মধ্যেই তাকে ব্যবহার করছি, তাই খুলে যাচ্ছে। যে আল্লাহ এই গ্রন্থ প্রদান করেছেন, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে আমি অক্ষম।'

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআনঃ সূচনা ও সমাপ্তি লগ্নে

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

> *যে বিষয়টি ভুল হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ দ্বারা আমাকে অবহিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ আমি তা সংশোধন করবো। আমি কেতাবুল্লাহর ব্যাপারে সজ্ঞানে ভুল করা কিংবা কোনো ভুলের ওপর অটল থাকা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।*

❑ আমি এ গ্রন্থের শাব্দিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ তথা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছি। তার কারণ এ নয় যে, আমি কোরআন মজীদের শাব্দিক অনুবাদ করাকে ভুল মনে করি। বরং তার মূল কারণ হচ্ছে, একাজটি ইতিপূর্বে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি উত্তমভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং এক্ষেত্রে এখন আর অধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। ফারসীতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের তরজমা এবং উর্দুতে শাহ্ আবদুল কাদের সাহেব, শাহ্ রফীউদ্দীন সাহেব, মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব ও হাফেয ফতেহ মোহাম্মদ জলান্ধরী সাহেবের অনুবাদ সে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে আদায় করে দিয়েছে, যার জন্য একটি শাব্দিক অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এমন কিছু প্রয়োজনও রয়েছে, যা শাব্দিক অনুবাদ দ্বারা পূর্ণ হয় না, হতে পারেও না। সেই প্রয়োজনকেই আমি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেছি।

অতপর যেহেতু কোরআনকে পূর্ণভাবে বোঝার জন্য তার নির্দেশাবলীর প্রেক্ষাপটও মানুষের সামনে থাকা প্রয়োজন, তাই আমি প্রতিটি সূরার শুরুতে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছি। এই ভূমিকায় আমি যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধান করে দেখাতে চেষ্টা করেছি ঐ সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছে, তখনকার পরিস্থিতি কি ছিল, ইসলামী আন্দোলন তখন কোন্ স্তরে ছিল, কি তখন তার প্রয়োজন

www.nagorikpathagar.org

ছিল এবং কি কি সমস্যা তখন তার সামনে দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া যেখানে কোনো বিশেষ আয়াত বা আয়াতসমূহের আলাদা কোনো শানে নুযুল রয়েছে, সেখানে আমি তাও পার্শ্বটীকায় লিখে দিয়েছি।

পার্শ্বটীকায় আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি এমন কোনো আলোচনার অবতারণা না করতে—যা পাঠকের মনোযোগকে কোরআন থেকে সরিয়ে অন্য কোনো দিকে ফিরিয়ে দেবে। যেসব পার্শ্বটীকা আমি লিখেছি তা দুই ধরনের স্থানেই আমি লিখেছি। প্রথম সেই স্থানে—যেখানে একজন সাধারণ পাঠক ব্যাখ্যা চাইতে পারে বলে আমি অনুভব করেছি। কিংবা তার মনে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে অথবা সে কোনো সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। দ্বিতীয় সেই স্থানে—যেখানে পাঠক বিনা চিন্তা-ভাবনায় দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং কোরআনের কথার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে না বলে আমার আশংকা হয়েছে।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি—যে উদ্দেশ্যে আমি এই মেহনত করছি তা যেনো পূর্ণ হয় এবং এই গ্রন্থ যেনো কোরআন মজীদ বোঝার ক্ষেত্রে আল্লাহর বান্দাদের জন্য বাস্তবিকই কিছুটা সহায়ক প্রমাণিত হয়।

ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান

১৭ যিল কা'দাহ ১৩৬৮ হিঃ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খৃঃ

❒ 'আমি খালেস দিলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করছি যে, তাফহীমুল কোরআন লেখার যে কঠিন কাজ আমি ১৩৬১ হিজরীর মোহররম মোতাবেক ১৯৪২ ঈসাই সনের ফেব্রুয়ারীতে শুরু করেছিলাম, তা ত্রিশ বছর চার মাস পর আজ সমাপ্ত হলো। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর একজন নগণ্য বান্দাকে তাঁর পবিত্র কেতাবের এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। এর মধ্যে যা কিছু শুদ্ধ ও সঠিক আছে, তা একান্ত আল্লাহর হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনেরই ফলশ্রুতি। আর কোরআনের ভাবানুবাদ ও তাফসীরে যেখানে আমি ভুল করেছি, তা আমার নিজের জ্ঞান ও বুঝেরই ত্রুটি। কিন্তু আমি সচেতনভাবে ও জেনে-বুঝে কোনো ভুল করিনি বলে আল্লাহর শোকর আদায় করি। তাই আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে তা ক্ষমা

www.nagorikpathagar.org

করে দেবেন। আর আমার এই কাজের মাধ্যমে যদি তাঁর বান্দাদের হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে কোনো উপকার হয়ে থাকে, তবে তাকে আমার মাগফেরাতের ওসীলা বানিয়ে দেবেন। আলেম সমাজের প্রতিও আমার আবেদন যে, তাঁরা যেনো আমার ভুলগুলো আমাকে অবহিত করেন। যে বিষয়টিই ভুল হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ দ্বারা আমাকে অবহিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ আমি তা সংশোধন করবো। আমি কেতাবুল্লাহর ব্যাপারে সজ্ঞানে ভুল করা কিংবা কোনো ভুলের ওপর অটল থাকা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

কেতাবের নাম থেকেই এটা স্পষ্ট, আমি এতে চেষ্টা করেছি যে, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে কোরআন সেইভাবে বুঝাব, যেভাবে আমি নিজে তা বুঝেছি। তার প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্যকে এইভাবে খুলে বর্ণনা করবো যে, মানুষ কোরআনের প্রাণ ও মূলতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সেই সব সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করবো এবং সেই সব প্রশ্নের জওয়াব দেবো, যা কোরআন কিংবা তার নিছক তরজমা পড়ে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আর সেইসব বিষয় সুস্পষ্ট করবো, যেগুলো কোরআন মজীদে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। শুরুতে আমার লক্ষ্য বেশী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা ছিল না। তাই প্রথম খন্ডের টীকা-টিপ্পনীগুলো সংক্ষিপ্ত ছিল। পরবর্তী সময় যতই আমি সামনে অগ্রসর হয়েছি, টীকা-টিপ্পনীতে অধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এমন কি পরবর্তী খন্ডগুলো যারা দেখেছেন তারা এখন প্রথম খন্ডের ক্ষেত্রে খুবই অতৃপ্তি অনুভব করছেন। কিন্তু কোরআন মজীদে আলোচ্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তির এটাও একটা ফায়দা যে, যে বিষয়টির ব্যাখ্যা এক স্থানে সংক্ষিপ্ত ও অতৃপ্ত রয়ে গেছে, তা যেহেতু পরবর্তী সূরাসমূহেও এসেছে, এজন্য তার পুরা ব্যাখ্যা পরবর্তী সূরাসমূহের টীকাগুলোতেই হয়ে যায়। আমি আশা করি, যারা কোরআন মজীদকে তাফহীমুল কোরআনের সাহায্যে শুধু একবার পড়ার ওপর যথেষ্ট মনে না করবেন, তারা পুরা কেতাবকে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় স্বয়ং অনুভব করবেন যে, পরবর্তী সূরাসমূহের ব্যাখ্যাগুলো পূর্ববর্তী সূরাসমূহ বুঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্যকারী প্রমাণিত হচ্ছে।'

৫-এ যিলদার পার্ক, ইচরা, লাহোর

২৪ রবিউস-সানী ১৩৯২ হিজরী, ৭ জুন ১৯৯২ ঈসাই

www.nagorikpathagar.org

কোন্ যুগ সন্ধিক্ষণে আমি তাফহীমুল কোরআন লিখতে শুরু করি

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

আল্লাহ তায়ালা যেনো আমার এই নগণ্য খেদমত কবুল করেন এবং এই গ্রন্থ যদি আল্লাহর কোনো একজন বান্দার হেদায়াতেরও ওসীলা হয়, তবে একে যেনো আমার মাগফেরাতের একটি উপায় বানিয়ে দেন।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং দুরূদ ও সালাম তাঁর সম্ভ্রান্ত রসূলের ওপর আর তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজন ও আসহাবের ওপর।

শ্রদ্ধেয় সুধিবৃন্দ!

আল্লাহ তায়ালার এই দয়া ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে, তিনি তাঁর পাক কেতাব-এর খেদমত করার তাওফীক আমাকে দান করেছেন এবং আমার সকল সংকট ও অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে এই তাফসীরের কাজ সম্পন্ন করার শক্তি দান করেছেন। এও আল্লাহরই সম্পূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহ যে, আমার এই নগণ্য খেদমতকে তাঁর বান্দারা পছন্দ করেছেন। আমি আশা করছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করছি যে, তিনি যেনো তাঁর বান্দাদের মতোই আমার এই খেদমত কবুল করেন। কেননা, যদি সারা দুনিয়ায়ও এটা কবুল হয় এবং আল্লাহর কাছে কবুল না হয়, তবে তার কোনো সার্থকতা নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার লোক যদি এটা কবুল না করে এবং আল্লাহর কাছে কবুল হয়, তবে তার মধ্যেই রয়েছে পরম সার্থকতা। এজন্য আমিও দোয়া করছি এবং আপনারাও দোয়া করুন যে, আল্লাহ তায়ালা

www.nagorikpathagar.org

যেনো আমার এই নগণ্য খেদমত কবুল করেন এবং এই গ্রন্থ যদি আল্লাহর কোনো একজন বান্দার হেদায়াতেরও ওসীলা হয়, তবে একে যেনো আমার মাগফেরাতের একটি উপায় বানিয়ে দেন।

সুধিবৃন্দ!

আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। আমি দাঁড়িয়েও থাকতে পারি না এবং বেশীক্ষণ বক্তৃতাও দিতে পারি না। তাই সংক্ষিপ্ত ভাবেই কিছু বলবো। এ কেতাব লেখা আমি সেই সময় শুরু করেছিলাম, যখন আমার জীবনে সবচেয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় শুরু হয়েছিল। আপনারা জানেন যে, জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালে গঠিত হয়েছিল। আর আমি এই তাফসীর ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে লেখা শুরু করছি। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী গঠিত হওয়ার ছয় মাস পর। তখন আমার ওপর একটি দলের সংগঠন-প্রশিক্ষণ ও একটি আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বও ছিল এবং তার সাথে ছিল এই তাফসীর লেখার দায়িত্বও। যে সম্পর্কে আমি মনে করতাম যে, যদি একটি শব্দও সাবধানতার বিপরীত বের হয়ে যায়, তবে তা আমার সারা জীবনের 'কামাই'কে বরবাদ করে দিতে পারে। যা হোক, এই উভয় কাজ আমাকে এক সাথে আঞ্জাম দিতে হয়ছে.......।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন শুরু করার সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম যে, আমি আমার কলম ও মুখ দ্বারা আল্লাহর দ্বীন বুঝানোর জন্য যতই চেষ্টা করি না কেনো, যে পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহর কেতাবের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বুঝানোর চেষ্টা করা না হবে, সে পর্যন্ত দ্বীনের পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এ কেতাব দ্বীন বুঝানোর জন্যই আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি দ্বীন বুঝাতে হয়, তবে এই কেতাব বুঝানোরই চেষ্টা করা উচিত। যে পর্যন্ত মানুষ এটি না বুঝবে, সে পর্যন্ত তার জন্য এই উদ্দেশ্য বুঝাই সম্ভব নয়—যে জন্য আমি ও আমার জামায়াত কাজ করছে। আমি যখন ১৯২৬ সনে 'আল জেহাদ ফিল ইসলাম' লেখা শুরু করি এবং এক্ষেত্রে কোরআন মজীদ ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র জীবন-চরিত ও হাদীসসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, তখন আমার সহসা মনে হলো যে, এ কেতাব তো একটি আন্দোলনের কেতাব। এটি নিছক তেলাওয়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার জন্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ায় একটি আন্দোলন গড়ে তোলা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

জীবন-চরিত অধ্যয়ন করে বুঝতে পারলাম যে, তাঁর জীবন হচ্ছে একটি আন্দোলনের দিশারী ও পথ-প্রদর্শকের জীবন। নিছক একজন পূণ্যবান ও সাধক মানুষের জীবন নয়। বরং এমন একজন মানুষের জীবন, যিনি আল্লাহর মাখলুকের হেদায়াতের জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং যাঁকে আল্লাহ তায়ালা এই কেতাব এ উদ্দেশ্যে দান করেছেন যে, তিনি এর দাওয়াতকে দুনিয়ার সমস্ত দাওয়াতের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। হাদীসসমূহ অধ্যয়ন কালে তার মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল যিনি মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছেন, তাদের চরিত্র গঠন করছেন এবং তাদেরকে সেই পথে চালানোর জন্য তৈরী করছেন—যে পথে আল্লাহর বান্দাদের চলা আল্লাহ তায়ালার কাম্য। সুতরাং তখন থেকেই আমার মনে এ ধারণা ছিল যে, যে পর্যন্ত ইসলামকে একটি আন্দোলন হিসাবে উপস্থাপন না করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি না করা হবে যে, তারা নিছক একটি বংশগত সম্প্রদায় নয়, বরং কার্যত একটি আন্দোলনের কর্মী, সে পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর যমীনে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এই ধারণা নিয়ে আমি অনেক বছর চিন্তা করেছি যে, এ কাজটি কি ভাবে করা যায়। শেষে ১৯৪১ সনে আমি জামায়াতে ইসলামী গঠন করি এবং তার সাথে সাথেই আমি 'তাফহীমুল কোরআন' লেখার সিদ্ধান্ত নিই।

আমার লক্ষ্য ছিল তখন প্রথমে কোরআন মজীদের তাফসীর লিখবো। তারপর রসূলের পবিত্র সীরাতের ওপর একটি গ্রন্থ লিখবো এবং তারপর হাদীসসমূহের একটি সংকলন তৈরী করে তার ব্যাখ্যা লিখবো। শুরুতে আমার লক্ষ্য এটাই ছিল। কিন্তু ত্রিশটি বছর তাফহীমুল কোরআন লিখতেই চলে গেলো। এখন শেষ সময়। আমার শক্তি নিশেষপ্রায়। এখন আমি অবশিষ্ট দুটি জিনিস শুরু করার উপযুক্ত নই। আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি তাফহীমুল কোরআনকে সম্পন্ন করিয়েছেন। বস্তুত যে অবস্থার মধ্য দিয়ে চলে আমি তা সম্পন্ন করেছি, তাতে পদে পদে এই আশংকা ছিল যে, হয়তো একাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমি ১৯৪২ সনে এটি শুরু করেছিলাম এবং ১৯৪৭ সনে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত পৌছলাম। তখন পূর্ব পাঞ্জাবে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলো। পাকিস্তান কায়েম হলো। সেখান থেকে নিসম্বল অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান পৌছলাম। এখানে

www.nagorikpathagar.org

আসার পর একটি ঠিকানা নির্মাণ করতে বেশ দেরী হয়ে গেলো। এরপর হঠাৎ করে আমার এই অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, এজাতির ওপর একটি স্বাধীন দেশ চালানোর দায়িত্ব-ভার এসে পড়েছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হচ্ছে তাদের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং তাদের সামনে তাদের জীবন লক্ষ্য সুস্পষ্ট করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে এখানে পুনরায় নতুনভাবে ইসলামী আন্দোলন শুরু করা হলো এবং আমি তাতে আত্মনিয়োগ করলাম। এরই প্রতিদানে আমাকে ১৯৪৮ সনে নযরবন্দী করা হলো এবং নযরবন্দী অবস্থায় আমাকে সেই সব কেতাব সরবরাহ করতে অস্বীকার করা হলো, যার দ্বারা আমি তাফহীমুল কোরআনের কাজ অব্যাহত রাখতে পারতাম। এইভাবে ১৯৪৭ সনের মাঝামাঝি থেকে নিয়ে ১৯৫০ সন পর্যন্ত এই কেতাব লেখার কোনো কাজ আমি করতে পারিনি। এই সময় জেলের মধ্যেই আমি সূরা ইউসুফ পর্যন্ত তাফহীমের রিভাইস দেয়ার কাজ সম্পন্ন করলাম। মোকাদ্দমা ও ভূমিকা লিখলাম এবং কেতাবটি এমনভাবে তৈরী করলাম যে, প্রথম খন্ড প্রকাশ করা সম্ভব হলো। মুক্তি পাওয়ার পর আমি সূরা ইউসুফের পরবর্তী সূরার তাফসীর লেখা শুরু করলাম। কিন্তু সূরা আম্বিয়া পর্যন্ত পৌঁছতেই ১৯৫৩ সনে পুনরায় গ্রেফতার করা হলো। দ্বিতীয় গ্রেফতারীর পর প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত কেতাব সরবরাহের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু আমাকে আমার পাঠাগার থেকে কেতাব আনার অনুমতি দেয়া হয়নি। দেড় বছর পর যখন অনুমতি পাওয়া গেলো, তখন আমি মুলতান জেলে সূরা আল-হজ্জ থেকে নিয়ে সূরা আল ফোরকান পর্যন্ত তাফসীর লিখলাম। এরপর মুক্তি পাওয়ার পর কাজ চলতে থাকলো। এমনকি যখন সূরা যুমার-এর তাফসীর সম্পন্ন করা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছলো তখন পুনরায় গ্রেফতার করা হলো। এবারো জেলের মধ্যে কেতাব সরবরাহের প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক হতে লাগলো। আমি ভেবে বিস্মিত হতাম, আমাদের জাতির শাসন-ক্ষমতা কি ধরনের লোকের হাতে রয়েছে যে, জেলের মধ্যে বসে কোরআনের তাফসীর লেখাও তারা সহ্য করতে পারে না। তারা একজন মানুষের সময় অহেতুক নষ্ট করছে এবং তাকে একটি কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখছে। যা হোক, অনেক বাদানুবাদের পর আমি কেতাব আনার অনুমতি পেলাম এবং আমি ঐসব সূরার তাফসীর লিখলাম, যা হা-মীম থেকে শুরু হচ্ছে এবং যেগুলোকে মোফাসসেরদের পরিভাষায় 'হাওয়ামীম' বলা হয়। চতুর্থ বার ১৯৬৭ সনে যখন জেলে যেতে হয়, তখন কেতাব আনার অনুমতি দিতে পুনরায় অস্বীকৃতি জানানো হয়। তাই সেখানে বসে আমি তৃতীয় খন্ডের

www.nagorikpathagar.org

রিভাইস দেয়ার কাজ করলাম। এরপর আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আমি কোনো না কোনোভাবে এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। অসুস্থ অবস্থায়ই আমি পঞ্চম খন্ড সম্পন্ন করি এবং এখন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে ষষ্ঠ খন্ড সম্পন্ন হলো।

নিসন্দেহে যে কাজটি আঞ্জাম দিতে ত্রিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে তার শুরু এবং শেষের মধ্যে বিরাট ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সূচিত হয়। একটি দীর্ঘ সময় যে কাজে ব্যয় হয়, তার মধ্যে মানুষের জ্ঞান-ভান্ডারও বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তাধারার মধ্যেও প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। এ জন্য প্রথম খন্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খন্ড বেশী বিস্তৃত। দ্বিতীয়টির চেয়ে তৃতীয়টি বেশী বিস্তৃত। তৃতীয়টির চেয়ে চতুর্থটি অধিক বিস্তৃত এবং এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড তো আরো অধিক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এ পার্থক্য আপনি এর দ্বারাই অনুমান করতে পারেন যে, প্রথম খন্ডে সাড়ে সাত পারার তাফসীর ছিল এবং শেষ খন্ডে শুধু এক সূরা ও দুই পারার তাফসীর। এখন মানুষ আমার কাছে এই আশা করে যে, আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড রিভাইস দিয়ে সে দুটিকেও পরবর্তী খন্ডগুলোর সমমানে এনে দেই। এখন আমি চিন্তা করছি একাজটি আমি করতে পারবো কিনা। কেননা, যে পদ্ধতিতে আমি তাফহীমুল কোরআনের শেষ খন্ডগুলো লিখেছি, যদি সেই পদ্ধতিতে আমি প্রথম খন্ডটি নতুনভাবে লিখি, তবে কমপক্ষে তিনটি খন্ড তৈরী হবে। আর দ্বিতীয় খন্ডটি যদি লিখি, তবে কমপক্ষে আরো দুটি খন্ড তৈরী হবে। এজন্য চিন্তা করছি এবং স্বয়ং আমারও ইচ্ছা যে, একাজটি আমি করবো। আপনারাও দোয়া করুন—আল্লাহ তায়ালা যেনো আমাকে একাজের শক্তি দান করেন এবং একাজ করার মতো আমাকে সুস্থতা দান করেন (আমীন আমীন ধ্বনি)। এখন আমি সীরাত (নবী-চরিত) ও হাদীস সংকলনের কাজ করতে না পারলেও কমপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডটি রিভাইস দিতে চাচ্ছি এবং সে দুটিকে বিস্তৃত করে দুটি পরিশিষ্ট আকারে দুটি খন্ড প্রথম খন্ডের সাথে এবং দুটি খন্ড দ্বিতীয় খন্ডের সাথে এ সংযোজন করবো। (ইনশা আল্লাহ)।

এসময় তাফহীমুল কোরআন-এর লেখক তিনটি দোয়া করেন। তিনি তাফহীমুল কোরআন সম্বন্ধে দোয়া করতে গিয়ে বলেন-

‘হে আল্লাহ! তোমার কেতাবের খেদমত করার জন্য আমি যেটুকু চেষ্টা করেছি, তা কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। আর এ জন্য যে, তা তোমার বান্দাদের জন্য পথ-প্রদর্শন ও হেদায়াতের মাধ্যম হবে। একাজে যা কিছু সঠিক হয়েছে, তা তোমারই পথ-প্রদর্শনের ফল। আর যা কিছু বেঠিক

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, তা আমারই ভুল ও অযোগ্যতার ফল। আমাকে এ তাওফীক দান করো যে, এতে যা কিছু ভুল হয়েছে, তা যেনো সংশোধন করতে পারি এবং তোমার বান্দাদেরকেও তাওফীক দান করো যে, যেখানে যেখানে আমার ভুল হয়েছে, তা যেনো তারা দলীল-প্রমাণ দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দেন আর আমি তা ইনশাআল্লাহ সংশোধন করবো। হে আল্লাহ! এ কেতাবকে কবুল করো এবং এ কেতাবকে তোমার বান্দাদের হেদায়াতের ওসীলা ও আমার মাগফেরাতের মাধ্যম করো। আমীন।'

স্বদেশের জন্য দোয়া করতে গিয়ে তাফহীমুল কোরআন-এর লেখক বলেন—

'সুধিবৃন্দ! এ দেশটির জন্যও দোয়া করুন। যার অর্ধেক চলে গেছে এবং অর্ধেক বাকী আছে। আর এ অর্ধেকও বেঁচে থাকে কিনা তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন—তিনি যেনো আমাদের ক্ষমা করেন। আমাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করেন। আমাদের ওপর দয়া করেন। আর যে শাস্তি আমরা পেয়েছি, তাকেই যেন তিনি যথেষ্ট মনে করেন। আর অধিক শাস্তি যেন তিনি আমাদের না দেন। হে আল্লাহ! তোমার নবীর (সঃ) এ উম্মতের মধ্যে এখনো কিছু কল্যাণ অবশিষ্ট আছে। এটি একেবারে কল্যাণশূন্য হয়নি যে, এর ওপর ব্যাপক শাস্তি প্রেরণ করে একে নিশ্চিহ্ন করা হবে। এর মধ্যে যে কল্যাণ অবশিষ্ট আছে, তাকে কাজ করার তুমি সুযোগ দাও। আর ভবিষ্যতের জন্য এ দেশটি রক্ষা করার দায়িত্ব তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দিও না। এ দেশটি রক্ষা করার দায়িত্ব তুমি তোমার নিজ হাতে নিয়ে নাও এবং স্বীয় অসীম শক্তি বলে তুমি একে স্থায়ী করো।'

'এ মুহূর্তে আমার এবং আমার অনেক সংগী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের ডাক্তার নাযীর আহমদ সাহেব মরহুমের কথা মনে পড়ছে—যাকে যুলুম করে হত্যা করা হয়েছে, তাকে বিনা দোষে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুন, তার শাহাদাত কবুল করুন। তাকে 'আলা ইল্লিয়্যীনে' স্থান দিন। আর যারা অজ্ঞতা ও নাদানীর দরুন আল্লাহর এক নেক বান্দাকে শহীদ করেছে, তাদেরকে তাদের অজ্ঞতার পরিণতি বুঝার ও এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খায়রে খালকিহী মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

১৯৭২ সালের ৩০শে জুন তারিখে নাগরিক সর্ম্বধনায় প্রদত্ত ভাষণ।

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে আমার নিজস্ব বক্তব্য

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

> *বিগত প্রজন্মের জন্য যতটুকু খেদমত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল তা আমি করেছি। এখন আমাকে আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু করতে দিন। সুতরাং এরপর আমি আমার সমুদয় মনোযোগ ও সমগ্র পরিশ্রম তাফহীমুল কোরআন সম্পন্ন করার কাজে নিয়োজিত রেখেছি।*

উপস্থিত ভদ্র মহোদয় ও প্রিয় নও জওয়ানরা! ইসলাম-প্রেমিক নওজওয়ানদের এই ফলন্ত শস্য শ্যামল পরিবেশ দেখে আমার মনের ওপর এমন প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে যাকে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—'ইউজিবুয্ যুররাআ লিয়াগীযা বেহিমুল কুফ্ফার।' অর্থাৎ কিষাণরা তাদের ফসল দেখে আনন্দিত হয় কিন্তু কাফেরদের তাতে অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি পায়। এ আয়াতের আরেকটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য হচ্ছে, 'কাফের' শব্দটি আরবী ভাষায় কৃষককেও বলা হয়। তাই কৃষকের বিপরীতে কাফের শব্দের ব্যবহার অর্থপূর্ণ। অর্থাৎ ভালোর ফসল বপনকারী আনন্দিত হয় এবং মন্দের ফসল বপনকারী হয় বিষণ্ন। সুতরাং এই ভালোর ফসল ফলতে দেখে আমার মন আনন্দিত হচ্ছে আর এটি দেখে মন্দের ফসল বপনকারীরা জ্বলছে অন্তর্জ্বালায়।

বিগত দু'তিন বছর ধরে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে দেখে কিছু লোক আমাকে সম সাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে ছুটাছুটি করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আর আমি তাদেরকে বলছিলাম যে, বিগত প্রজন্মের জন্য যতটুকু খেদমত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল তা আমি করেছি। এখন আমাকে আগামী

www.nagorikpathagar.org

প্রজন্মের জন্য কিছু করতে দিন। সুতরাং এরপর আমি আমার সমুদয় মনোযোগ ও সমগ্র পরিশ্রম তাফহীমুল কোরআন সম্পন্ন করার কাজে ব্যয় করেছি। কেননা, আমি মনে করতাম যে, আগামী প্রজন্মদের ইসলামের ওপর কায়েম রাখার জন্য এটি ইনশাআল্লাহ সহায়ক হবে। আল্লাহর শোকর যে, যে নব প্রজন্মের জন্য আমি একাজটি করছিলাম তারা তা পছন্দ করেছে এবং তাদের মধ্যে এটি স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এখানে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদেরকে বলবো যে, তাফহীমুল কোরআন ও আমার অন্যান্য বই পুস্তকে ইসলামকে সত্য প্রমাণিত করা এবং তাওহীদ, রেসালাত, ওহী, আখেরাত ও ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতিমালাকে যথার্থ প্রমাণিত করার জন্য আমি যে যুক্তিধারা অবলম্বন করেছি, তা মূলত আমার সেই তথ্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতি, যা আমি আমার জীবনে সচেতনতা আসার পর শুরু করি। যদিও আমি এক দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার মরহুম পিতা ও মরহুমা মাতা দুজনই ছিলেন খুব দ্বীনদার। আমি তাঁদের নিকট থেকে পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলাম। কিন্তু যখন আমি বোধজ্ঞানসম্পন্ন হলাম, যৌবনে প্রবেশ করলাম, তখন আমি চিন্তা করলাম যে, আমি কি কেবল মুসলমানের সন্তান বলেই মুসলমান? যদি এজন্য আমার মুসলমান হওয়া যথার্থ হয়, তবে এই কারণেই তো একজন খৃস্টানেরও একটি খৃস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার দরুন তার খৃস্টান হওয়া যথার্থ হবে ? আর একজন হিন্দুরও একটি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করার দরুন তার হিন্দু হওয়া যথার্থ হবে। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাকে স্বয়ং তথ্যানুসন্ধান করে এটা অবগত হতে হবে যে, প্রকৃত সত্য কি ও কোনটি। এ ক্ষেত্রে আমি আমার নিজস্ব রায়কে অকার্যকর রাখলাম। আমি জড়বাদী কিংবা নাস্তিক হয়ে যাইনি। আমি শুধু আমার নিজস্ব মতামতকে নিষ্ক্রিয় রেখেছি এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছি। আমি বেদসমূহের প্রতিটি শব্দের অনুবাদ পড়েছি। গীতার প্রতিটি শব্দ পড়েছি। হিন্দু ধর্মের দর্শন, হিন্দু ধর্মের ইতিহাস ও হিন্দু শাস্ত্রসমূহ পড়েছি। বৌদ্ধ ধর্মের মূল পুস্তকগুলোর ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। অনুরূপভাবে বাইবেল পুরোপুরি পড়েছি এবং পক্ষপাতমূলক অধ্যয়ন এড়ানোর জন্য ডোমিলোর ব্যাখ্যার সাহায্যে তা পড়েছি। আমি আমার মন থেকে যাবতীয় পক্ষপাতিত্বকে সরিয়ে দিয়ে এ বিষয়গুলো পড়েছি, যাতে প্রকৃত সত্য কি বা

www.nagorikpathagar.org

কোন্‌টি তা খুঁজে বের করতে পারি। খৃস্টবাদ ও ইহুদী ধর্ম উভয়টি সম্পর্কে আমি ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করেছি। খোদ্ খৃস্টান ও ইহুদীদের নিজস্ব লেখা বই-পুস্তক পড়েছি। তালমুদের যতগুলো খন্ড আমি পেয়েছি সবগুলো পড়েছি। আমি জড়বাদী, নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের দর্শনগুলো পড়েছি এবং যেসব লোক বিজ্ঞানের নামে দুনিয়ায় নাস্তিক ও জড়বাদ প্রচার করেছে, সেগুলো পড়েছি।

যেসব পশ্চিমা চিন্তাবিদের পেছনে আজ পাশ্চাত্য জগত চলছে, তাদের জীবনী-গ্রন্থও পড়েছি। যেনো এটা বুঝতে পারি এই লোকগুলো সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্থিরমস্তিষ্ক ছিল কিনা। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, একজন লোক বিরাট যুক্তি-প্রমাণ সহকারে একটি মতবাদ পেশ করে, কিন্তু তার কর্মকান্ড বলে দেয় যে, তার চিন্তাশক্তি ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। তাই আমি তাদের চিন্তাধারা পড়ার সাথে সাথে তাদের জীবনকথাও পড়েছি। যেনো আমি বুঝতে পারি প্রকৃতপক্ষে তারা মানবতার নির্ভরযোগ্য দিশারী হতে পারে কিনা।-এই সমুদয় অধ্যয়ন করার পর আমি কোরআন মজীদকে গভীরভাবে পড়েছি। কেননা, শৈশবকাল থেকেই আমার শিক্ষা ছিল আরবী। তাই অনুবাদের সাহায্যে তা পড়ার প্রয়োজন আমার হয়নি। আমি সরাসরি কোরআন বুঝতে পারতাম এবং আমি বারবার ভালভাবে বুঝে তা পড়েছি। অনুরূপভাবে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিতের ওপর লেখা উৎস-গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছি এবং নবী (সঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য হাদীসের কেতাবসমূহ পড়েছি। এই ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, কোরআন মজীদের পেশ করা দ্বীনের চাইতে অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অধিক প্রামাণ্য দ্বীন আর নেই এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ পথ-প্রদর্শকও কেউ নেই। আর মানব জীবনের জন্য এর চেয়ে সবিস্তার ও সঠিক প্রোগ্রাম কোথাও পেশ করা হয়নি— যেরূপ কোরআন ও হাদীসে পেশ করা হয়েছে।

অতএব, আমি নিছক পৈতৃক ধর্ম হওয়ার কারণে ইসলামের অনুসারী হইনি। বরং স্বীয় তথ্যানুসন্ধান দ্বারা যাচাই-বাছাই করে আমি এই ধর্মে ঈমান আনয়ন করেছি। আপনারা দেখতে পারেন যে, তাফহীমুল কোরআনের যেখানে যেখানে আমি আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহের তাফসীর করেছি, সেখানে যুক্তিপূর্ণভাবে তার যথার্থতা দলীল-প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এ হচ্ছে সেই সব দলীল-প্রমাণ যার দ্বারা আমি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যথার্থতার নিজে প্রবক্তা হয়েছি। যার দ্বারা আমি তাওহীদের প্রবক্তা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছি। যার দ্বারা আমি রেসালাত-বিশ্বাসী হয়েছি। যার দ্বারা আমি ওহী বিশ্বাস করেছি। যার দ্বারা আমি ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়া বিশ্বাস করেছি। যার দ্বারা আমি একথা বিশ্বাস করেছি যে, ইসলাম সর্বযুগের জন্য মানব জাতির উৎকৃষ্টতম পথ-প্রদর্শক। এটাই হচ্ছে সেই কথা, যা আমি আমার এক লেখায় বলেছি যে, আমি মূলত একজন নও মুসলিম—নিছক বংশগত মুসলমান নই।

এটা এই অধ্যয়ন ও তথ্যানুসন্ধানেরই ফল যে, এ সাহায্যে আমি আল্লাহর সৃষ্টিকুলকে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলাম বুঝানোর জন্য চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, এ দ্বীন পূর্ণরূপে মানুষের বুঝে আসতে পারে না, যে পর্যন্ত সরাসরি কোরআনের মাধ্যমে তা বুঝানো না হবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাফহীমুল কোরআনের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সীরাত ও হাদীসের একটি সংকলন ব্যাখ্যাসহ তৈরি করা—যাতে দ্বীন বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো রকম ত্রুটি না থাকে। কিন্তু ত্রিশটি বছর এই প্রথম কাজটিতেই কেটে গেলো। আর এখন কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করার শক্তি আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তথাপি আপনারা দেখবেন, আমি কোরআন মজীদের তাফসীর করেছি সীরাতে পাক দ্বারা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এবং স্থানে স্থানে আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে এটা সুস্পষ্ট করে তুলেছি যে, নুযুলে কোরআন ও সীরাতে রসূলে আকরাম (সঃ)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলী কিভাবে একটি অপরটির সাথে পাশাপাশি চলছে। অনুরূপ স্থানে স্থানে আমি কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ ও আহকামের ব্যাখ্যায় নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহ উদ্‌ধৃত করেছি। যার দরুন হাদীস ও কোরআনের সম্পর্কও উত্তমরূপে সুস্পষ্ট হয়। আর এ ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ অবশিষ্ট থাকে না যে, হাদীস ছাড়াও কোরআন বুঝা যেতে পারে। বরং পাঠকদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, হাদীস ছাড়া কোরআনের বহু বাণী ও বিধানকে মানুষ বুঝতেই সক্ষম নয়। তাই যে উদ্দেশ্যে তাফহীমুল কোরআনের পর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম, তা মোটামুটি তাফহীমুল কোরআনেই পূর্ণ হয়ে গেছে।

প্রিয় বন্ধুরা! আমি আপনাদের কাছেও আবেদন করবো, আপনারাও ইসলামকে খুব বুঝে-শুনে সচেতনভাবে এর ওপর ঈমান আনয়ন করুন। সচেতনভাবে এটা স্বীকার করুন যে, আল্লাহ আছেন এবং নিশ্চিতভাবে তিনি একক। আর সমগ্র বিশ্বজগত তাঁরই সৃষ্ট। সচেতনভাবে এটা স্বীকার করুন যে,

www.nagorikpathagar.org

আখেরাত আছে এবং নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর আমাদের উঠতে হবে। আর নিশ্চিত ভাবে আল্লাহর কাছে জওয়াব দিতে হবে। সচেতনভাবে এটা স্বীকার করুন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বাস্তবিকই আল্লাহর নবী ছিলেন এবং তাঁর উপর বাস্তবিকই আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী আসতো। সচেতনভাবে এটা জানুন যে, দ্বীন-ইসলাম কি, জীবনের আচার-ব্যবহারে তা আমাদের কি পথ প্রদর্শন করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্ত নিবেন যে, তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। যদি এই সচেতন ঈমান অর্জিত না হয় এবং নিছক তাকলীদী ঈমানের মাধ্যমে মানুষ নামায-রোযা করতে থাকে, তবে আপনি তার জীবনে সেই সমুদয় মোনাফেকী ও সেই সমুদয় বৈপরীত্য দেখবেন, যা এখানে কেবল সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেই নয়, তাদের বড় বড় নেতা ও তাদের বড় বড় দলের মধ্যেও দেখা যায়। খালেস ইসলাম তখনই হাসেল হয়, তখন মানুষ তার জ্ঞান অর্জন করে। ইসলাম ও অ-ইসলামের পার্থক্য বুঝে। চিন্তা-ভাবনা করে ঈমান আনে এবং এটা অবগত হয় যে, যে জিনিসটি আমি বিশ্বাস করি তা বিশ্বাস করার দাবী কী এবং তা বিশ্বাস করার পর কি করা আবশ্যক আর কি করা উচিত নয়। এরপর মানুষের জন্য এটা সম্ভবপর থাকে না যে, তার জীবনের মধ্যে বৈপরীত্য ও পরস্পর প্রতিকূলতা হবে। সে বলবে একটা এবং করবে আরেকটা। তার মৌলিক দাবী হবে কিছু, আর তার চরিত্র ও কর্ম হবে অন্য কিছু। বুঝ-ব্যবস্থা ও সচেতনতার সাথে ঈমান আনার পর এই অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর মানুষ যা কিছু করে চিন্তা-ভাবনা করে খাঁটি দিলে করে এবং তারপর সে একমুখী ও একনিষ্ঠ মুসলমানে পরিণত হয়। কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম আলায়হেস সালামের সবচেয়ে বড় প্রশংসা এই করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ। সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি একমুখী হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি আমার এই বক্তৃতা এই দোয়ার সাথে শেষ করছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেনো মুসলমান জওয়ানদের খাঁটি মুসলমান বানান এবং তাদেরকে জান, মাল, শক্তি, শ্রম, যোগ্যতা—সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করার তাওফীক দান করেন। আর এই ভূখন্ডে—যা ইসলামের ঘর ছিল এবং ইসলামের জন্যই বানানো হয়েছিল, তাকে পথ ভ্রষ্টকারীদের থেকে পবিত্র করেন। আর সেই সব লোককে সাহায্য ও সহায়তা করেন যারা এই ভূখন্ডকে প্রকৃতই দারুল ইসলাম (ইসলামের ঘর) বানাতে চায়। আমীন।

১৫ই জুলাই, ১৯৭২ সনে ছাত্রদের পক্ষ থেকে আয়োজিত তাফহীমুল কোরআনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআনের প্রকাশনা কিভাবে শুরু হলো
সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

যদি আমরাও সাধারণ পত্র-পত্রিকার মালিকের মতো মিথ্যা কথাকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করি, তবে এরপর অন্যদেরকে কোরআনী শিক্ষা গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়ার আমাদের কী অধিকার থাকতে পারে?

তাফহীমুল কোরআনের মরহুম প্রকাশক শায়খ কামরুদ্দীন এ কাজের পূর্বে ইসলামী ক্যালেন্ডার, ঈদকার্ড ও স্টিকার ছাপার কাজ করতেন। বরং কার্যত তিনি ছিলেন এ ময়দানে নিত্য নতুন আইডিয়ার উদ্ভাবক। তিনি একাজ ১৯২৬ সনে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে তার এই কাজ অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে।

বই-পুস্তক ছাপার কাজ শায়খ সাহেব ১৯৪৪-৪৫ সনে শুরু করেন। প্রথমে অতি সুন্দর সোনালী রঙে সূরা ইয়াসীন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। শায়খ সাহেবের দীর্ঘ দিনের আশা ও আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা ছিল যে, তাঁর জীবন কোরআন মজীদের সেবা ও তার পয়গাম প্রচারের কাজে উৎসর্গ করবেন। ১৯৪৮ সনে শায়খ সাহেব যখন দ্বিতীয়বার হজ্জে গেলেন, তখন সেখানে তিনি কাবার গেলাফ আঁকড়ে ধরে এবং কেঁদে কেঁদে এই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন।

১৯৪৯ সনের শেষ দিকে যখন তাফহীমুল কোরআন প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি তাফহীমুল কোরআন প্রথম খন্ডের পান্ডুলিপি পান। শায়খ মোহাম্মদ কামরুদ্দীন বলেন, তাফহীমুল কোরআনের পান্ডুলিপি পেয়ে তিনি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তখন এর গুরুত্ব পরিমাপ করতে পারেননি।

www.nagorikpathagar.org

دفتر ترجمان القرآن
خیرت آباد۔ حیدرآباد دکن

مورخہ ۱۱ر جمادی الاولیٰ [illegible]

مکرمی السلام علیکم

عنایت نامہ [illegible] شکریہ۔ ہمارے کام میں دیانت و صداقت سب سے

پہلا اصول ہے۔ اگر ہم بھی عام ارباب جرائد و رسائل کی طرح [illegible]

بنائیں تو ہم جیسے دوسروں کو قرآنی تعلیم کی دعوت دینے کا کیا حق [illegible]

ہم پوری صداقت کے ساتھ آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ ترجمان القرآن کی

اشاعت اس وقت [illegible] ہے۔ [illegible] اس وقت [illegible]

শায়খ কামরুদ্দীন সাহেবের নামে মাওলানা মওদূদীর চিঠির প্রতিলিপি।

Printed by the Supdt.. Govt. Ptg. West Pb.—1949

FORM B

(See Rule 21 of the Punjab Communal Detenu Rules, 1946)

Full name of sender: ابوالاعلیٰ مودودی

Full name, address and relationship of addressee and of any other persons mentioned in the letter: جناب سید ابوالخیر صاحب مودودی

۵-اے، ذیلدار پارک، اچھرہ، لاہور

To be detached here

نیو سنٹرل جیل ملتان Jail

جانِ پدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ [illegible]

[illegible]

تفہیم القرآن کی [illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

Signature of censoring officer	Date	Name of sender
Mohammad Afzal	۱۶ر فروری ۵۰ء	ابوالاعلیٰ مودودی

সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীর নামে মাওলানার চিঠির প্রতিলিপি।

www.nagorikpathagar.org

بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے تفہیم القرآن کا سارا مواد ناشر کو ہدایت کی تھی کہ جزو جزو جو فارم چھپتے جائیں

وہ مجھے بھیجے جائیں تاکہ میں انڈکس بنا دوں۔ لیکن اب جو طریقہ ہمیں کتابیں دینے اور ہماری بھیجی ہوئی چیزیں دینے کا ہے، یعنی سات

سات ماہ میں پہنچتا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر میں نے خود انڈکس بنانے کی کوشش کی تو یہ کتاب بہت دیر

میں شائع ہو سکے گی۔ بلکہ عجب نہیں کہ میرا بنایا ہوا انڈکس آپ لوگوں کو پہنچ ہی نہ سکے۔ اسلیے اب میں نے یہ خیال چھوڑ دیا ہے۔

میری رائے میں اب مناسب یہ ہے کہ آپ خود ہی انڈکس بنا دیں اور اس میں حسب ذیل باتوں کا لحاظ رکھیں:

۱ - مصری کتابوں کی طرح فہرست اسماء، فہرست مقامات اور فہرست موضوعات الگ الگ نہ بنائی جائیں بلکہ سب کو یکجا رکھا جائے تاکہ ناظرین کو ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ فہرستیں دیکھنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

۲ - ایک عنوان کے تحت ذیلی عنوانات کی فہرست بھی بنائی جائے۔ مثلاً صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ ہو کہ حضرت ابراہیمؑ کا نام جہاں جہاں آیا ہے ان صفحات کے نمبر دے دیے جائیں، بلکہ جتنے مختلف پہلوؤں سے ان کا ذکر کتاب میں ہوا ہے ان کو الگ الگ درج کر دیا جائے۔ اسی طرح اعتقادی مسائل، فقہی احکام، اخلاقی ہدایات کو بھی جہاں تک ممکن ہو کھول کر ہر ایک کے مختلف گوشوں کو نمایاں کر دیا جائے۔

۳ - ایک موضوع کے لیے ایک عام ناظر کے ذہن میں جتنے الفاظ آ سکتے ہیں ان سب کو ابجدی فہرست میں درج ضرور کر دیا جائے، اگرچہ اس موضوع کے متعلق حوالے ایک ہی لفظ کے تحت درج ہوں۔ مثلاً عقیدۂ تقدیر کے متعلق جملہ تفصیلات تو کسی ایک ہی لفظ کے تحت دی جائیں لیکن قضا و قدر، مشیت، تقدیر، وغیرہ جتنے الفاظ بھی اس مسئلے پر سوچتے وقت عام ناظرین کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان سب کو اپنے اپنے مقامات پر درج کر کے اس خاص لفظ کا حوالہ دے دیا جائے جس کے تحت تفصیلات درج کی گئی ہیں۔

۴ - انڈکس میں آپ زبان میری ہی استعمال کریں۔

۵ - جہاں تک ممکن ہو انڈکس اتنا جامع اور مفصل بنایا جائے کہ کتاب کے تمام فوائد ناظرین کی دسترس میں آ جائیں۔

میری صحت اب خدا کے فضل سے روبہ صحت ہے۔ آپ کے ہاں سے جو دوائیں پہنچی گئی تھیں۔ ان کے استعمال سے کافی فائدہ ہوا۔

اعتقادی مسائل، فقہی احکام، اخلاقی ہدایات کو بھی جہاں تک ممکن ہو کھول کر ہر ایک کے مختلف گوشوں کو نمایاں کر دیا جائے۔

۳ - ایک موضوع کے لیے ایک عام ناظر کے ذہن میں جتنے الفاظ آ سکتے ہیں ان سب کو ابجدی فہرست میں درج ضرور کر دیا جائے، اگرچہ اس موضوع کے متعلق حوالے ایک ہی لفظ کے تحت درج ہوں۔ مثلاً عقیدۂ تقدیر کے متعلق جملہ تفصیلات تو کسی ایک ہی لفظ کے تحت دی جائیں لیکن قضا و قدر، مشیت، تقدیر، وغیرہ جتنے الفاظ بھی اس مسئلے پر سوچتے وقت عام ناظرین کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان سب کو اپنے اپنے مقامات پر درج کر کے اس خاص لفظ کا حوالہ دے دیا جائے جس کے تحت تفصیلات درج کی گئی ہیں۔

۴ - انڈکس میں آپ زبان میری ہی استعمال کریں۔

۵ - جہاں تک ممکن ہو انڈکس اتنا جامع اور مفصل بنایا جائے کہ کتاب کے تمام فوائد ناظرین کی دسترس میں آ جائیں۔

میری صحت اب خدا کے فضل سے روبہ صحت ہے۔ آپ کے ہاں سے جو دوائیں پہنچی گئی تھیں۔ ان کے استعمال سے کافی فائدہ ہوا

کمیِ خون کی وجہ سے جو شکایات پیدا ہو گئی تھیں اب وہ بڑی حد تک دور ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ جو باقی ہیں وہ بھی جلدی دور ہو جائیں گی۔ گھر میں سب کو اطمینان دلا دیں۔

میری طرف سے والدہ صاحبہ قبلہ کی خدمت میں آداب عرض کر دیں اور سب کو سلام و دعا، بچوں کو پیار

آپ کا

ابوالاعلیٰ

SIGNATURE OF CENSORING OFFICER	DATE	NAME OF SENDER
[signature] 10/5/50.	۸ مئی ۱۹۵۰	ابوالاعلیٰ مودودی

জেল থেকে তাফহীমুল কোরআনের প্রকাশনা সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর লেখা নির্দেশনাবলী চিঠিটি জনাব আবুল খায়েরের নামে প্রেরিত।

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআন যখন প্রকাশিত হলো এবং তৃষ্ণার্তেরা এই কুয়োর দিকে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কি বিরাট সৌভাগ্য প্রদান করেছেন।

শায়খ কামরুদ্দীন ও তাফহীমুল কোরআন প্রণেতার মধ্যে যোগাযোগের সূচনা হয়েছিল তাফহীমুল কোরআন প্রকাশের বহু পূর্বেই।

১৯৩৩ সনে যখন শায়খ সাহেব মাওলানা মওদূদীর মাসিক তরজুমানুল কোরআনে (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য) তার ইসলামী স্টিকার ও কার্ডের একটি বিজ্ঞাপন ছাপাতে চান, তখন মাওলানা সর্বপ্রথম তাকে পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করলেন এবং লিখেন যে, বর্তমানে তরজুমানুল কোরআনের সার্কুলেশন মাত্র পৌনে ছয়শত। তখন শায়খ সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করলে মোহতারাম মাওলানা দ্বিতীয় চিঠিতে পুনরায় একই কথা বলেন। শায়খ কামরুদ্দীন এই ব্যাপারটিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং এরপর আগত প্রতিটি দিন তাকে মুসলিম বিশ্বের এমন এক ব্যক্তিত্বের কাছে নিতে থাকলো, যিনি পরবর্তীকালে তাফহীমুল কোরআন প্রণেতা হওয়ার সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জন করলেন এবং স্বয়ং শায়খ কামরুদ্দীন তাফহীমুল কোরআনের প্রকাশনা শুরু করার মর্যাদা লাভ করলেন।

দফতর তরজুমানুল কোরআন
খয়রাতাবাদ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য
১১ জমাদিউল উলা, ১৩৫২ হিজরী

মোকাররমী! আসসালামু আলাইকুম

পত্র পেয়েছি। শোকরিয়া। আমাদের কাজে ঈমানদারী ও সততা হচ্ছে সর্ব প্রথম নীতি। যদি আমরাও সাধারণ পত্র-পত্রিকার মালিকের মতো মিথ্যা কথাকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করি, তবে এরপর অন্যদেরকে কোরআনী শিক্ষা গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়ার আমাদের কী অধিকার থাকতে পারে? আমি আবার সততার সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে, তরজুমানুল কোরআনের প্রকৃত সার্কুলেশন (প্রচার সংখ্যা) এখন পৌনে ছয়শত। এখন সাড়ে সাত।

১৯৪৯ সনের শেষ দিকে যখন মুলতান জেল থেকে তাফহীমুল কোরআন প্রণেতার পাঠানো পান্ডুলিপি শায়খ সাহেব হাতে পান, তখন সর্বপ্রথম সমস্যা

www.nagorikpathagar.org

দেখা দিলো ভালো কাতেবের। কয়েকজন কাতেবের দ্বারা নমুনা স্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা করে লেখানো হলো। কাতেব নির্বাচনের পর 'কেতাবত' করে লেখার কাজ শুরু করানো হলো।

মাওলানা মওদূদী মুলতান জেল থেকে একাজের বিশেষ তত্ত্বাবধান করছিলেন। তিনি কেতাবতের প্রতিটি দিক সম্পর্কে নির্দেশনা লিখে পাঠাতেন। সঠিক কেতাবত সম্পর্কে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ তাঁর বড় ভাই জনাব আবুল খায়ের মওদূদীর কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকেও একথাটা বুঝা যায়। তাতে তিনি লিখেন,

'তাফহীমুল কোরআনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমি ভীষণভাবে চিন্তিত। আমি প্রকাশককে তাকীদ করে বলেছি যে, তিনি যেনো কপি ও প্রুফ দুই দুই জন লোক দিয়ে পড়ান এবং প্রতিটি কপি ও প্রতিটি প্রুফ যেনো দুইবার করে পড়া হয়। কিন্তু তারপরও 'কেতাবত' নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত নই। আমার মতে, যে দুইজন লোক কপি ও প্রুফ দেখবেন তাদের মধ্যে একজন হবেন আপনি। কেননা, আমার ভাষা ও লেখার ভঙ্গি সম্পর্কে আপনি ভালভাবে অবগত। আপনি যদি পছন্দ করেন, তবে আমার এই প্রস্তাব প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দেবেন।'তাফহীমুল কোরআন প্রথম খন্ডের কেতাবত ও ছাপার কাজ নভেম্বর (১৯৫১) মাসে শেষ হয়।

শায়খ কামরুদ্দীন সাহেবের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একাজের পুরস্কার এইভাবে দেয়া হয়েছিল যে, তার বাসগৃহ ও ছাপাখানা সিআইডির আক্রমণের শিকার হলো। এটা এক আজব ও অদ্ভুত কান্ড ছিল যে, সিআইডি'র লোকেরা সেইসব লোকের পাহারায় ব্যস্ত ছিল—যারা কোরআন মজীদের তাফসীরের কাজ করতো।

কিন্তু এই কাজ যেরূপ ছিল ভুল, তেমনি ছিল অবৈধ ও অনর্থক। কেননা, এর দ্বারা তাফহীমুল কোরআনের পয়গাম রোধ করা যায়নি। তখন পর্যন্ত তার প্রথম খন্ড ৩২ হাজার কপি প্রকাশিত হয়েছে এবং এক একটি কপি হাজার হাজার লোক পাঠ করছেন। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে উর্দু জানা লোক আছে অথচ তাফহীমুল কোরআন সেখানে পাঠানো হচ্ছে না। আর এখন তো ব্যাপারটি কেবল উর্দু ভাষা পর্যন্তই সীমিত নেই। তাফহীমুল কোরআন এখন বহু বিদেশী ভাষায় ভাষান্তরিত হচ্ছে।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ ভাষায় এযাবত তাফহীমুল কোরআন অনূদিত হয়েছে, সে ব্যাপারে স্বতন্ত্র প্রতিবেদন আমরা আমাদের পরবর্তী কোনো এক বইতে পেশ করবো ইনশাআল্লাহ — সম্পাদক

www.nagorikpathagar.org

নিউ সেন্ট্রাল জেল মুলতান থেকে লেখা

ভাই সাহেব!

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ!

আমি তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে প্রকাশককে বলেছিলাম যে, এর যে যে ফর্মা ছাপা হবে, তা আমার কাছে পাঠাতে থাকবেন। তাহলে আমি সূচিপত্র তৈরী করে দেবো। কিন্তু এখন যে পদ্ধতি আমার কাছে কেতাব পৌছানো ও আমার জিনিসগুলোকে বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে অবলম্বিত হচ্ছে, তা দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে যদি আমি নিজে সূচিপত্র তৈরী করার চেষ্টা করি, তবে এ কেতাব প্রকাশিত হতে অনেক দেরী হবে। বরং আশ্চর্য নয় যে, আমার তৈরী করা সূচিপত্র আপনাদের কাছে পৌছতেই পারবে না। তাই আমি এখন এ চিন্তা ত্যাগ করেছি। আমার মনে হয় ভালো হবে আপনি নিজেই একটা সূচিপত্র তৈরী করুন। তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেনঃ

১) মিসরীয় কেতাবের মতো নামসমূহ, স্থানসমূহ ও আলোচ্য বিষয়সমূহের সূচিপত্র পৃথক পৃথক তৈরী করবেন না। বরং সবগুলো এক জায়গায় রাখবেন। যাতে পাঠকদের প্রতিটি জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক সূচি দেখার কষ্ট করতে না হয়।

২) এক শিরোনামার 'অধীনে কিছু উপ-শিরোনামারও সূচি তৈরী করবেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম যেখানে যেখানে এসেছে কেবল সেই সব পৃষ্ঠার নম্বরগুলো দিয়েই যথেষ্ট করবেন না, বরং তাঁর যতগুলো দিক সম্পর্কে কেতাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেবেন। অনুরূপ আকীদাগত মাসায়েল, ফেকহী আহকাম, নৈতিক উপদেশগুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে প্রত্যেকটির বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন।

৩) একটি বিষয়ের জন্য একজন সাধারণ পাঠকের মনে যতগুলো শব্দ আসতে পারে তার সবগুলো বর্ণমালা ক্রমানুসারে লিখে দেবেন। যদিও ঐ বিষয় সম্পর্কিত রেফারেন্স একই শব্দের আওতায় লেখা হোক। যেমন, তাকদীর সম্পর্কিত আকীদার সমস্ত ব্যাখ্যা তো কোনো একটি শব্দের আওতায়ই লেখা

www.nagorikpathagar.org

হবে কিন্তু কাযা ও কদর, আল্লাহর ইচ্ছা-আকাংখা, তাকদীর প্রভৃতি যত শব্দই এ বিষয়টি চিন্তা করার সময় সাধারণ পাঠকের মনে আসে, সেগুলোকে নিজ স্থানসমূহে লিখে ঐ বিশেষ শব্দটির হাওয়ালা দেয়া হবে, যার আওতায় বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয়েছে।

৪) সূচিপত্রে আপনি আমার ভাষাই ব্যবহার করবেন।

৫) যথাসম্ভব সূচিপত্র এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত তৈরী করবেন যাতে কেতাবের সমস্ত উপকারিতা পাঠকদের সামনে আসে।

আমার স্বাস্থ্য এখন আল্লাহর ফযলে ভালো। আপনার চলে যাওয়ার পর ওষুধ পৌঁছে গিয়েছিল। সেগুলো ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার হয়েছে। রক্তশূন্যতার দরুন যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল এখন তা অনেকটা দূর হয়েছে। আশা করি, যা অবশিষ্ট আছে, তাও দ্রুত সেরে যাবে। ঘরের সবাইকে সান্ত্বনা দেবেন।

আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয়া মা-কে সালাম জানাবেন। বাকী সবাইকে জানাবেন সালাম ও দোয়া। বাচ্চাদের জন্য রইল আমার আদর ও স্নেহ।

আপনার

আবুল আলা

www.nagorikpathagar.org

একটি মহান তাফসীর ও একজন মহা মোফাসসের

মুফতী সাইয়েদ সাইয়াহ উদ্দীন

> *সাইয়েদ কুতুব শহীদ সঠিক কথাই লিখেছেন, সঠিক পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন আমাদের সামনে রয়েছে। এই তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব শহীদের বর্ণিত বাস্তবতার বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।*

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।

এই অনুষ্ঠানে জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ ঘটেছে। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাফসীর তাফহীমুল কোরআন রচনা শেষ করেছেন। সেই গৌরবময় ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আমরা এই অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছি। আল্লাহ পাক মাওলানাকে একটি অসাধ্য সাধন করার শক্তি দিয়েছেন। শুধু বর্তমান কালের মানব জাতির জন্যই নয় বরং কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ পথিবীতে আসবে তাদের কল্যাণ সাধনে মাওলানা মওদূদীর এই তাফসীর দিক-নির্দেশনা দেবে। এজন্য আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করছি। প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরামদের রীতি এমন ছিল যে, তারা এধরনের বিশাল খেদমত শেষ করার পর আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। সেই অনুষ্ঠানে বন্ধু-বান্ধব এবং জ্ঞানীগুণীদের দাওয়াত দিতেন। প্রখ্যাত মোহাদ্দেস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বোখারী শরীফের অতুলনীয় ব্যাখ্যা-ভাষ্য 'ফতহুল বারী' দীর্ঘ পঁচিশ বছরে রচনা করেন। এ পবিত্র কাজ শেষ হওয়ার পর শহরের ওলামা-মাশায়েখদের দাওয়াত দিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে তাফসীর তাফহীমুল কোরআন সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

সাহাবায়ে কেরামের সময়কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কোরআনুল করীমের বহু সংখ্যক তাফসীর লেখা হয়েছে। প্রত্যেক যুগের মোফাসসেরগণ সেই সময়ের দাবী ও চাহিদা সামনে রেখে জনগণের মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাফসীর রচনা করেছেন। সর্বাত্মক উপায়ে সেই তাফসীরকে জনকল্যাণকর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ একটি বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, কেউ অন্য বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিটি তাফসীরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে অনন্য বলা যায়। কোরআনের জ্ঞান প্রতিটি তাফসীরেই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের ইলমী ও দ্বীনী খেদমত কবুল করুন। তাদের সকলের কবরকে আলোকিত করুন।

উর্দু ভাষায় হযরত শাহ আবদুল কাদের রচিত তাফসীর মু'যেহুল কোরআনের পর থেকে বহু তাফসীর রচিত হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতে বহু ওলামায়ে কেরাম তাফসীর রচনা করেছেন। প্রতিটি তাফসীরই বাগানের নানা রং এর নানা সুগন্ধির ফুলের সাথে তুলনীয়। এই সব তাফসীর প্রত্যেকটির পরিচিতি এবং বৈশিষ্ট আলাদা। কোনো তাফসীরই বিশেষ কল্যাণময়তা থেকে মুক্ত নয়। বর্তমান কালের মুসলমানদের জন্য এমন একটি তাফসীরের বিশেষ প্রয়োজন, যে তাফসীর সকল প্রকার সন্দেহ-শোবা-সমস্যার সঠিক সমাধান নিশ্চিত করবে। ইউরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের বিভ্রান্ত করছে। এই বিভ্রান্তি যুবকদের মধ্যে ইসলামী আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও প্রচার করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মাওলানা মওদূদীর অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে এই কাজও একটি বিস্ময়কর সংস্কারমূলক কাজ। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এই তাফসীর রচনার কাজ শুরু করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর ১৯৭২ সালে তা শেষ করেন।

এলমী মাসায়েল অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাফহীমুল কোরআনে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়াবলীতে কোরআনের শিক্ষাকে তাফহীমুল

www.nagorikpathagar.org

কোরআনে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, সেসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। যেসব ওলামায়ে কেরাম মুসলিম জনগণের নিকট ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন অথবা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটি পরামর্শ রয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই পরামর্শ দিতে চাই। তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে তাফসীর তাফহীমুল কোরআন অধ্যয়ন করেন, তারপর শ্রোতাদের সম্বোধন করেন, তবে বহু দুর্লভ তথ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। এতে শ্রোতারাও অনেক জ্ঞানার্জন করতে পারবেন। আধুনিককালে সৃষ্ট প্রশ্ন এবং বহুমুখী সমস্যার উত্তর ও সমাধান তারা খুঁজে পাবেন। কোরআনের যে কোন আয়াতের পাশাপাশি তাফহীমুল কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখনই আমি পাঠ করেছি, তখনই আমার মনে হয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য এই আয়াত এখনই নাযিল হয়েছে। আমরা যেসব সমস্যায় জড়িয়ে গেছি, সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাফসীর তাফহীমুল কোরআনে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব যেভাবে দেয়া হয়েছে এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন এক চিরন্তন গ্রন্থ এবং কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান এই গ্রন্থে রয়েছে। ইসলামের পথ চিরকালের জন্য মুক্তির পথ, কোরআন একটি জীবন্ত ও শাশ্বত গ্রন্থ। সকল যুগের জন্য সকল জাতির জন্য এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট পথের দিশা রয়েছে। এই গ্রন্থে রয়েছে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। মানুষের সত্যিকার কল্যাণ, মানসিক শান্তি কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার ওপর নির্ভর করে। তাফহীমুল কোরআনে এই সব বিষয়কে যুক্তি-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এই তাফসীরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এতে কোরআন মজীদের দাওয়াতী বৈশিষ্টকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে যেখানে যেখানে নবী করীম (সঃ)-এর সীরাত বা সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে নবী চরিত এবং সাহাবাদের জীবন-কথা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এসব আলোচনায় বিশ্বাস ও ভালোবাসার চিত্র প্রেরণামূলক ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন যে, যিনি এসব ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন তিনি নিজে যেমন উচ্চাঙ্গের ঈমানী শক্তি সম্পন্ন, তেমনি অন্যাদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যেও সেই ঈমানের আলো প্রজ্বলিত করতে চেয়েছেন। রসূলে আকরাম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে সবাই জীবনকে সফল ও সুন্দর করে গড়ে তুলবেন তিনি তাই চান।

মূলত তাফহীমুল কোরআনের আলোচনার সাথে সাথে এর অনেক বৈশিষ্টই সামনে এসে যায়। এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করার সুযোগ নেই। এখানে আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের এবং সুধীবৃন্দের কাছে তাফসীরে তাফহীমুল কোরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট তুলে ধরতে চাই।

এটা অবধারিত সত্য যে, একটি গ্রন্থে সেই গ্রন্থকারের জ্ঞান ও কাজকর্ম, চরিত্র-বৈশিষ্ট স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে। গ্রন্থকার না চাইলেও তার মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা সেই গ্রন্থে প্রতিফলিত হবেই এতে কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তির জীবন কোরআনের শিক্ষার নমুনা পেশ করে, যে ব্যক্তির জীবনের কাজ-কর্মে কোরআনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়, যে ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নে জীবনের সকল শক্তি ও মেধা ব্যয় করেন, যার শিক্ষা-সাধনা, লেখা-গবেষণা ব্যক্তি-জীবন মননশীলতায় কোরআনের আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটে, যে ব্যক্তি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আদর্শ ও চিন্তা শুধু কোরআনকে ঘিরেই গ্রহণ করেন, তার কাজ-কর্ম, প্রেম-ভালোবাসা জ্বালা-যন্ত্রণা কোরআনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তিনি যখন কাগজের বুকে আঁচড় কেটে কিছু লিখে গেলেন সেই লেখায় চেতনে অবচেতনে তার চিন্তাধারার ছায়াপাত ঘটবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই লেখা যারা পাঠ করবেন, তাদের চোখের সামনে অবশ্যই সেই লেখকের মতাদর্শ ও জীবন-চেতনার রূপরেখা ফুটে উঠবে। সেই লেখা পাঠ করে অন্য সবাই অনুপ্রাণিত হবে এবং নিজেদের জীবন গঠনে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করবে। তাফহীমুল কোরআনের পাতায় পাতায় আমি এই প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছি। তাফহীমুল কোরআন যিনি রচনা করেছেন, তার জীবন কোরআনের শিক্ষার বাস্তব প্রমাণ। একারণেই তার লেখার মধ্যে আল্লাহ্ পাক আমলকারী দ্বীনের আহবানকারীদের কথার মতো বিস্ময়কর প্রভাব রেখেছেন।

মর্দে মোজাহেদ শহীদ সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর এক জায়গায় লিখেছেন, সেই ব্যক্তিই দ্বীনের সারকথা বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, যিনি একামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা ও

www.nagorikpathagar.org

সাধনা করেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে যিনি কষ্ট সহ্য করেন, অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মোকাবেলা করেন এবং সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতি সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেন। এমনি করে যিনি লক্ষ্য পথে অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে যান। সাইয়েদ কুতুব শহীদ সঠিক কথাই লিখেছেন, সঠিক পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন আমাদের সামনে রয়েছে। এই তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব শহীদের বর্ণিত বাস্তবতার বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

পবিত্র কোরআন সত্য-মিথ্যার সংঘাতের বহু অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরে। কোরআন থেকে আমরা এটা জানতে পারি যে কিভাবে মিথ্যা ও অসত্যের অনুসারীরা দ্বীনের দাওয়াতকে নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য আশংকাজনক মনে করে। তারা তাদের মিথ্যা প্রভুত্বের অহংকারে এবং নিজেদের মনগড়া আইন-কানুন তৈরী করে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না। তারা ধোকা-প্রতারণা-জালিয়াতি, মিথ্যা অপবাদ, অত্যাচারের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক তাদের সকল চক্রান্ত, সকল কারসাজি ব্যর্থ করে দ্বীনের সৈনিকদের সহায়তা করেন। পবিত্র কোরআনে মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য অতীতকালের বহু ঘটনা একাধিক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তারাও কৌশল অবলম্বন করে আর আল্লাহ পাকও কৌশল অবলম্বন করেন এবং আল্লাহই কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।' এই আয়াত এবং এধরনের অন্যান্য আয়াতের যেরকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন তার মূল্য ও মর্যাদা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। মাওলানা মওদূদী এ যুগের শ্রেষ্ঠ একজন দ্বীনের আহবানকারী। মাওলানা মওদূদী তাঁর পর্বসূরীদের মতো দ্বীনের দাওয়াতের পথে বহু রকমের বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেছেন। তিনি ফাঁসীর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন 'ডেথ সেল' বা মৃত্যুর কক্ষে। তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সকল অস্ত্রই ব্যবহার করা হয়েছে। মাওলানা মওদূদীকে সত্যের পথ থেকে, দ্বীনের দাওয়াতের পথ থেকে ফেরানোর জন্য অপবাদ, মিথ্যা অভিযোগ, গালাগাল, জেল-যুলুম সব কিছুই প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের সাহায্যের কারণে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা, চক্রান্তকারীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যে, তাদের অনেকের নামও আজ কারো মনে নেই। অথচ মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কোরআন রচনা করে গৌরব-উজ্জ্বল আসনে সমাসীন হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানাকে অসামান্য মেধা, প্রজ্ঞা, বাকপটুতা, লেখনী শক্তি ও অনুরূপ বহু যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি যৌবনের শুরু থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত সবরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই সব শক্তি ও যোগ্যতাকে সত্য দ্বীনের বিজয় ও আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার কাজে ব্যয় করেছেন। দাওয়াত, সংশোধন এবং একামতে দ্বীনের সংগ্রামে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এই নৈরাজ্যকর যুগে তার পক্ষ থেকে এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের এক বিশেষ সেবা ও রূহানী খেদমত। তাঁর এই বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের ঝলক তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন-এর রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আফসোস! হযরত মাওলানা যে আপনজনদের ইযযত-আব্রু কায়েম রাখার জন্য সর্বদা শত্রুদের সাথে লড়াই করেছেন, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মোকাবেলা করেছেন এবং এলহাদ ও ধর্মহীনতার ছড়ানো শোবা-সন্দেহ দূর করার জন্য মস্তবড় কাজ করেছেন, তাঁর এই মহৎ কাজের সবচেয়ে বেশী অবমূল্যায়ন সেই আপনজনরাই করেছেন। মাওলানার বিরুদ্ধে তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন, অপবাদের বিষাক্ত তীর বর্ষণ করেছেন। সর্বোপরি তারা এমন সব কিছুই করেছেন যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন ছিল ভুল, তেমনি নৈতিক দিক থেকেও ছিল দূষণীয়। আর কার্যত দ্বীনী প্লাটফরমের মোকাবেলায় তা বিধর্মী মহলেরও হাত শক্তিশালী করছিল। এটা স্পষ্ট যে, যার কল্যাণ কামনা করা হয়, তার তরফ থেকে যদি অমঙ্গল কামনা তথা কুৎসা রটানো হয়, তবে তা সহ্য করা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা মাওলানারই একক কৃতিত্ব যে, তিনি এক্ষেত্রেও সর্বদা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। প্রতিটি বলা ও লেখার মাধ্যমে যে কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছে তার জওয়াবে শক্তিমান বাগ্মী ও শক্তিশালী লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং 'ওয়া উফাব্বেযু আমরী ইলাল্লাহে ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল-এবাদ' পাঠ করে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। অতএব, কর্মক্ষেত্রে যার ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সহ্যশক্তি এরূপ হয়, একমাত্র তাঁর পক্ষেই সবরের আয়াতসমূহের প্রকৃত তাফসীরকার হওয়া সম্ভব এবং তাঁর তাফসীর গ্রন্থ থেকেই প্রকৃত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সংযম শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে।

এখানে আমি এই কথা কটি বলেই আজকের আলোচনা শেষ করছি।

১৯৭২ সালের ২০শে জুন লাহোরে তাফহীমুল কোরআনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

www.nagorikpathagar.org

তাফহীমুল কোরআনের ঢেউ
লাহোর থেকে নায়রোবী

আবদুর রহমান বযমী

> *ওস্তাদ মওদূদী এযুগের তাফসীরের ইমাম। হায়! আমি যদি উর্দু ভাষা জানতাম এবং তাফহীমুল কোরআন পাঠ করে তার থেকে সরাসরি উপকার লাভ করতে পারতাম!'*

সোহেলী ভাষা পূর্ব আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যবহৃত হলেও এই ভাষাটি আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা রাখে। কেনিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সোহেলী ভাষার পাশাপাশি অসংখ্য ভাষা প্রচলিত আছে। কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশে উর্দু ভাষার যে মর্যদা পূর্ব আফ্রিকায় সোহেলী ভাষারও একই মর্যাদা। স্বীয় গঠন-কাঠামোর দিক দিয়েও সোহেলী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি, প্রবাদ বাক্য ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে বহুলাংশে আরবী ভাষার কাছে ঋণী।

মুসলমানদের জনসংখ্যা তাঞ্জানিয়ায় শতকরা ৬০-৬৫, উগান্ডায় শতকরা ৪০-৪৫ এবং কেনিয়ায় শতকরা ২৫-৩০ জন। কিন্তু বস্তুগত উপায়-উপকরণের স্বল্পতা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে সোহেলী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দারুণ অভাব। কোরআন পাকের সোহেলী তরজমা ও তাফসীরের অতি আবশ্যকতা দীর্ঘ দিন থেকে অনুভূত হচ্ছিল। এটি একটি বিরাট কাজ ছিল। তা সম্পন্ন করা মূলগতভাবে তো কোনো আফ্রিকী ভাষাভাষী আলেমে দ্বীনেরই কাজ ছিল। কিন্তু বস্তুগত উপায়-উপকরণের দিক থেকে তা অনেকটা নির্ভর করতো পূর্ব আফ্রিকায় বসবাসকারী এশীয় মুসলমানদের ওপর। এ শতকের শুরু থেকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বহু নামী-দামী ওলামায়ে কেরাম এদেশে আসতে শুরু করেন এবং এশীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বীয় মূল্যবান ভাষণ ও ওয়ায-নসীহত করে ফিরে যান। তাদের মধ্যে অনেক আলেমই কোরআন করীমের সোহেলী তরজমা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশের ওপর গুরুত্বও আরোপ করেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কিছুই করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে এই সৌভাগ্য বরাদ্দ ছিল অন্য কোনো মনীষীর জন্য।

পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানগণ একাধিক বার ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী-কে এদেশে আগমন করার দাওয়াত দেন। মোহ্তারাম মাওলানা স্বীয় অসুস্থতা কিংবা অন্যান্য অনেক ব্যস্ততার কারণে আসতে পারেননি। আর যখন তিনি এখানে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন পাকিস্তান সরকার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে তাঁর তাবলীগী সফরের পথ রুদ্ধ করে দেন।

মোহতারাম মাওলানা যদিও স্বয়ং এখানে আসতে পারেননি, কিন্তু পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানদের সমস্যাবলী ও তাদের দ্বীনী প্রয়োজনসমূহ তার পূর্ণ উপলব্ধিতে ছিল। মাওলানা মোহতারামের আদেশে চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ (মরহুম) বার বার এখানে এসেছেন এবং পূর্ব আফ্রিকায় দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভ্রমণ করে অবস্থা অবহিত হন। তিনি প্রবীণ ও নবীনসহ সাধারণ মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করেন, তাদের সমস্যাবলী ও প্রয়োজনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং কোরআন করীমের সোহেলী তরজমার অতি আবশ্যকতাও পূর্ণভাবে অনুভব করেন।

জাঞ্জিবারের এক খৃস্টান পাদ্রী সোহেলী ভাষায় কোরআন পাকের প্রথম তরজমা করেন এ শতকের শুরুর দিকে। তা সে সময় প্রকাশিতও হয়েছিল। দ্বিতীয় তরজমা করেছে কাদিয়ানীরা। তাও অনেক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। এই উভয় তরজমার প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ এ সত্য দ্বারাই অনুমিত হয় যে, তার কোনোটারই দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়নি। মুসলমানরা সার্বিকভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৯৫০ সনে জাঞ্জিবারের সাবেক কাযী শায়খ আবদুল্লাহ সালেহ ফারসী কোরআন পাকের একটি বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীর প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু নামা সংকট ও জটিলতার দরুন এক যুগ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হতে পারেনি। যদিও তিনি খন্ড খন্ড করে তার পনেরোটি পারা প্রকাশ করিয়েছিলেন, কিন্তু এর মুদ্রণ মান ছিল নিম্ন এবং তার প্রচার সংখ্যা ছিল নিতান্ত সীমিত।

১৯৬৫ সনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এই তরজমাটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এ সংক্রান্ত সকল সংকট কাটিয়ে উঠে তা প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করেন। আর এইভাবে সোহেলী ভাষায় মুসলমানরা কোরআন পাকের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তরজমা লাভ করেন।

মোহতারাম মাওলানার এই শুভ উদ্যোগ পূর্ব আফ্রিকার দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত স্বরূপ এমন একটি মহান কাজ, যার জন্য তিনি মুসলমানদের সামষ্টিক

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ তায়ালার বিরাট পুরস্কার পাবার অধিকারী। এই তরজমা উৎকৃষ্ট ছাপায় সজ্জিত হয়ে আরবী মতনের সাথে ১৯৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসে নায়রোবীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় এবং পূর্ব আফ্রিকার আশপাশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তার দ্বিতীয় পুন-পরীক্ষিত সংস্করণ ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রথম সংস্করণের ছাপার কাজ ১৯৬৭ সনে শুরু হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় শায়খ আবদুল্লাহ সালেহ ফারসী জাঞ্জিবার থেকে মোমবাসা চলে আসেন এবং সরকার তাঁকে কেনিয়ার প্রধান বিচারপতি (কাযিউল কোযাত) নিয়োগ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান জনাব আবদুল হালীম বাট ও লেখক ঐ সময় মোমবাসায় অবস্থান করছিলেন। সোহেলী তরজমার ছাপার কাজ শুরু হলে শায়খ আবদুল্লাহ সালেহ ফারসী তার পান্ডুলিপি ছাপার জন্য তৈরী করা, তা টাইপ করানো ও প্রুফ পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। অনেক স্থান পুন-পরীক্ষা ও সংশোধন-উন্নয়নের কাজও চলছিল। আবদুল হালীম বাট ও লেখক প্রায় প্রতিদিন শায়খ সাহেবের কাছে হাযির হতেন এবং তাফসীরের বিন্যাস ও মুদ্রণের বিভিন্ন দিক ও নিত্য নতুন সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ হতো।

এই সময় চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ (মরহুম) তরজমা ও তাফসীর পর্যালোচনা করে এই প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তাফহীমুল কোরআনের নমুনায় ভূমিকা ও সূরাসমূহের পরিচিতিমূলক নোট লিখলে তাফসীরের উপকারিতা অনেক বেড়ে যাবে। লেখক তাফহীমুল কোরআন থেকে সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার পরিচিতিমূলক ব্যাখ্যার ইংরেজী তরজমা করে শায়খ আবদুল্লাহ ফারসীকে দেখালেন, যা তিনি খুব পছন্দ করলেন। কিন্তু তাতে একটি জটিলতা দেখা দিলো যে, তখন তাফহীমুল কোরআন অসম্পূর্ণ ছিল এবং অর্ধেকের চেয়েও কম সূরার পরিচিতি পাওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই হলো যে, প্রথম সংস্করণে সূরাসমূহের পরিচিতিমূলক ব্যাখ্যা বাদ দেয়া হবে এবং শুধু তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকার তরজমা শামিল করা হবে। সুতরাং মোহতারাম মাওলানা খলীল হামীদী মরহুম তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকার আরবী তরজমা প্রস্তুত করে প্রেরণ করলে আমি সেটি নিয়ে শায়খ ফারসী সাহেবের কাছে পৌঁছলাম। তিনি সেটি এক নযর দেখলেন এবং বললেন যে, তিনি রাতে ধীরে-সুস্থে এটি পড়বেন।

দ্বিতীয় দিন আমি পুনরায় তাঁর নিকট হাযির হলাম। তরজমাটি শায়খ সাহেবের সামনেই ছিল এবং তাকে খুব আনন্দিত বলে মনে হচ্ছিল। আমাকে দেখেই তিনি বললেন যে, 'আমি তোমার এনাতেযার করছিলাম। আমি এই ভূমিকাটি তিন-চার বার পড়েছি।' এরপর শায়খ সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত ভক্তি ও আনন্দেরসাথে তাফহীমুল কোরআনের তরজমাটি বুকের সাথে লাগিয়ে অত্যন্ত প্রেমিকসুলভ ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, ওস্তাদ আবুল আলা মওদূদীর সঠিক স্থান ও মর্যাদা আমি আজ অবগত হয়েছি। আমি বড় বড় কেতাব পড়েছি। কিন্তু কোরআনী চিন্তার এই অনুভূতি এবং কোরআন-গবেষণার এই রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি। ওস্তাদ মওদূদী এযুগের তাফসীরের ইমাম। হায়! আমি যদি উর্দু ভাষা জানতাম এবং তাফহীমুল কোরআন পাঠ করে তার থেকে সরাসরি উপকার লাভ করতে পারতাম!'

এখানে বলা আবশ্যক যে, তাফসীর শাস্ত্রে শায়খ আবদুল্লাহ ফারসীর ওস্তাদের সিলসিলা সরাসরি জালালাইন শরীফের প্রণেতা-দ্বয় শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী (রঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। শায়খ সাহেব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী-র সমুদয় আরবী ও ইংরেজী পুস্তক পাঠ করেছেন। কিন্তু তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকা তাঁর মন-মস্তিষ্কে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে।

এরপর কোরআন করীমের তাফসীরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান সম্পর্কে শায়খ সাহেবের সাথে ভাব-বিনিময় হতে থাকে। তাফসীরের জটিল স্থানগুলোতে তিনি আবদুল হালীম বাট সাহেবের কাছে কিংবা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, এই স্থানে মাওলানা মোহতারাম কী লিখেছেন? সূরা আহযাবে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন'-এর বিষয়টি এলে আমরা মাওলানা মোহতারামের 'খতমে নবুয়ত' বইটি তাঁকে দেখালাম। ধারণা ছিল যে, দুই-তিন বৈঠকে এই বইটির ইংরেজী অর্থ তাঁকে বলে দেয়া যাবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য একই বৈঠকে হাসিল হয়ে গেলো। এসম্পর্কে আমাদের বেশী কিছু বলার প্রয়োজনই হয়নি। এ বইয়ের আরবী এবারত (পাঠ), রেফারেন্স ও তার বিন্যাসধারা দেখে শায়খ আবদুল্লাহ সালেহ ফারসী এই আলোচনা ও ভাবার্থ সুন্দরভাবে বুঝে গেলেন। এটি মাওলানা মোহতারামের অনুপম সুন্দর রচনার উজ্জ্বল প্রমাণ।

কোরআন করীমের সোহেলী তরজমা প্রকাশের পর অসংখ্য প্রশংসামূলক পত্র আমাদের কাছে এসেছে। তাতে সোহেলী তাফসীরের প্রশংসার সাথে সাথে মাওলানা মোহাতারামের 'তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকা'র ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কোরআন পাকের সোহেলী তরজমার প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা—ইস্ট আফ্রিকান স্ট্যান্ডার্ড-এ একটি ক্রোড়পত্র ছাপা হয়। তাতে তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকার পূর্ণ ইংরেজী তরজমা প্রকাশ করা হয়। ইংরেজী পড়ুয়া মুসলমানগণ এটা খুব পছন্দ করেন। আশা করা যায়, আগামী সংস্করণসমূহে ইনশাআল্লাহ সোহেলী তরজমায় তাফহীমুল কোরআন থেকে সূরাসমূহের ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

আপনি কেন তাফহীমুল কোরআন পড়বেন

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমি আপনাকে তাফহীমুল কোরআনের অনেক কথাই বলবো। কিন্তু সাথে সাথে এও বলবো যে, তাফহীমুল কোরআন কী —এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ জওয়াব তাফহীমুল কোরআন পাঠ করেই পাওয়া সম্ভব।

তখন ছিল ইসলামী আন্দোলনে আমার শামিল হওয়ার প্রাথমিক কাল। আমি সে সময় মাওলানা আবদুর রহীম ও জনাব আবদুল খালেকের 'দরসে কোরআন' শোনার জন্য আসতাম। তাদের কথা বুঝানোর ভঙ্গিতে এরূপ আকর্ষণ অনুভব হতো যে, প্রতিটি কথা অন্তরে বভে যেতো। একদিন আমি তাজ্জব হয়ে আবদুল খালেক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে, দরসে কোরআন দিতে গিয়ে আপনি আমাদেরকে প্রতিটি কথা এমন ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, এতে যেমন আশ্চর্য হতে হয়, তেমনি আনন্দিতও হতে হয়। আপনি এই কথাগুলো কোত্থেকে শিখেছেন? আবদুল খালেক সাহেবের জওয়াব ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, 'তাফহীমুল কোরআন থেকে'।

তাঁর এই জওয়াবে আমার মনেও তাফহীমুল কোরআন পড়ার আকাংখা সৃষ্টি হলো। আর এই ভাবে কেবল তাফহীমুল কোরআন পড়া ও বুঝার জন্য আমি উর্দু ভাষা শিখলাম। এখন আমি তাফহীমুল কোরআন সরাসরি সাইয়েদ মওদূদীর ভাষায় পড়ছি ও তার থেকে উপকৃত হচ্ছি।

এই অধ্যয়ন আমার জীবনে একটা মৌলিক প্রভাব ফেলেছে। বহু বছর অবধি যেসব সমস্যা সমাধানের জন্য পেরেশান ছিলাম এবং নানা চিন্তা-কল্পনার উপত্যকায় ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, তাফহীমুল কোরআন পড়ার পর এরূপ সমুদয় গ্রন্থি খুলে গেছে এবং আমি এখন সন্তুষ্ট হতে পেরেছি। বরং আপনি যদি সন্তোষের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলবো যে, আজ ১৯৭২ সনে কোনো ব্যক্তি যদি এদেশে সবচেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতে পারতো, তবে তা হওয়া

www.nagorikpathagar.org

উচিত ছিল আমার। কিন্তু এর বিপরীত, যেসব অবস্থা আমার অপরিসীম অসন্তুষ্টির ভিত্তিভূমি হতে পারতো, তাই আজ আমার একীনের কলেবরকে বৃদ্ধি করেছে। আমি তাফহীমুল কোরআনের ভাষায় জাতিসমূহের উত্থান-পতন, আল্লাহ্‌র পথে কর্মরত মোজাহেদদের পরীক্ষা ও আল্লাহ্‌র নিয়মকে তাদের জীবনে কার্যকর হতে দেখেছি এবং এ সত্য অনুধাবন করেছি যে, মুসলমানরা এ দুনিয়ায় কিভাবে উন্নতশির হতে পারে ও তার অবনত-মস্তক হওয়ার কারণসমূহ কি। আপনি আমার কথাটিকে এরূপ বুঝে নিন যে, আমি তাফহীমুল কোরআন পড়ছি এবং তাকে সদা আমার আশপাশে দেখতে পাচ্ছি।

তাফহীমুল কোরআন পড়ার পূর্বে

এক সময় আমার ধারণা ছিল, আল্লাহ্‌র কালাম বুঝা আমার মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এতো এমন এক বিরাট ও জটিল গ্রন্থ, যা কেবল পাঠ করাই সহজ, তার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা ও তা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাফহীমুল কোরআনের অধ্যয়ন আমার এই সকল চিন্তা দূর করে দিয়েছে এবং আমার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার বিধান ও নির্দেশনা বুঝতেও সক্ষম। তাফহীমুল কোরআন আমাকে এই অনুভূতি দান করেছে যে, যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী তাঁর বান্দাদের কল্যাণ ও পথ-প্রদর্শনের জন্য নাযিল করেছেন, তখন কোন অবস্থায়ই তিনি তা উপলব্ধির পথ দুর্গম করেননি। একথা যখন আমি বুঝে নিয়েছি তখন বাকী সমস্ত কথাই আমার বুঝে এসে গেছে।

যুব শ্রেণী তাফহীমুল কোরআন কেনো পড়বে

এ শতাব্দী ব্যস্ততা ও হাঙ্গামার শতাব্দী। এ যুগ বিশৃংখলা ও উত্তেজনার যুগ। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে যা কিছু দিতে পারতো তা দিয়ে দিয়েছে। এখন দুনিয়ার মানুষ দেখতে পারে যে, তারা এর ফলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটা দেখার জন্য চোখ খোলার প্রয়োজন। আর এ কাজটিই মানুষ করুক তা এ সভ্যতা চায় না। এর মতবাদসমূহ মানুষকে জানোয়ার ও জীবজন্তু বানানোর জন্য বদ্ধপরিকর। এর দর্শন মানুষকে জানোয়ার প্রমাণিত করেই তবে সন্তুষ্ট হয়। এই ধারার সমুদয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে একটি। আর তা হলো মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে বেপরোয়া করে দেয়া। (আর এ উদ্দেশ্যের জন্যেই মানুষকে

www.nagorikpathagar.org

আগে জানোয়ার প্রমাণিত করা একান্ত প্রয়োজন) তাফহীমুল কোরআন এক কদম এগিয়ে এসে চিন্তাধারার ওপরই সর্বপ্রথম আঘাত হেনেছে। আমার মতে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ—যে জন্য মুসলমান যুব শ্রেণীর তাফহীমুল কোরআন পড়া উচিত। আর আমি এ বিষয়টি আধুনিক শিক্ষিত ও আরবী শিক্ষিত—এ উভয় যুব শ্রেণীর লোকদের জন্য একান্ত আবশ্যক মনে করছি।

আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা আজ সমাজের কম-বেশী সর্বস্তরে ক্ষমতাবান। আজকের যুব শ্রেণী যখন কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে দেশ শাসন ও সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, এক প্রজন্ম যেনো অন্য প্রজন্মের স্থান দখল করছে। এসব লোক যে ধাঁচে গড়ে উঠেছে, অন্যরাও সেই ধাঁচে নিজেদেরকে গড়ে চলেছে। এরা যদি ইসলামের রঙে রঙিন হয়, ঈমানদার হয়, সৎ হয়, তাদের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য পালন করার সময় সেই আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকে, যা ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়, তবে স্পষ্টতই তার প্রভাব সমাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—যাকে ইংরেজদের দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বলাই অধিক সঙ্গত, বিগত ২৫ বছর অবধি সমাজকে যা কিছু দিয়ে চলছে এবং সমষ্টিগতভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এবং বিশেষত বিদেশী কলেজসমূহ থেকে—যা আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং যেগুলোতে আমাদের শাসকরা শিক্ষা লাভ করছেন—যে ধরনের লোক বের হয়ে উপরে আসছে, তারা আমাদের চোখের সামনেই উপস্থিত এবং তাদের কৃতকর্মও সবার সামনে রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত যুব শ্রেণীর পশ্চিমা চিন্তাধারা ও তাদের 'ইজম' সমূহের জাল থেকে বেরিয়ে আসা। নিজেদেরকে চেনা, আল্লাহর পয়গাম জানা এবং তার সত্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাফহীমুল কোরআন একাজটি অতি সুন্দরভাবে আঞ্জান দিচ্ছে। এটি পাঠ করলে আমাদের যুব সমাজ নিজেরাও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবে এবং দুনিয়ার মানুষকেও পরিচিত করাতে পারবে। তাফহীমুল কোরআনের এই সৌন্দর্যের দরুন আমি তাকে বলি দ্বীনী শিক্ষার 'মেইড ইজি'।

মাদ্রাসা শিক্ষিত যুব সমাজকে আমি তাফহীমুল কোরআন পড়ার পরামর্শ এজন্য দেবো যে, তাদেরকে এই জড়বাদী যুগে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাফহীমুল কোরআন পড়ার পর তারা একাজটি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে করতে পারবেন। এ যুগের সৃষ্ট প্রশ্ন ও আপত্তিগুলো তাদের সামনে থাকলে তারা তার পূর্ণ জওয়াব দিতে সক্ষম হবেন।

www.nagorikpathagar.org

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাফহীমুল কোরআনের অধ্যয়ন কেবল আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজ কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষিত যুব সমাজের জন্যই জরুরী নয়, বরং আমাদের সবার জন্যই আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। এটা কি সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন নয় যে, তারা কোরআনের পয়গাম ও তার শিক্ষা গ্রহণ করবে? বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে এটা কি বিশ্ব মুসলিমের জন্য প্রয়োজন নয় যে, তারা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধুনিক সভ্যতার ভ্রান্তি ও তার বিস্তার করা সন্দেহ-সংশয় থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করবে?

তাফহীমুল কোরআন এ ব্যবস্থাই করেছে এবং তা এভাবে করেছে,—

এটি প্রমাণ করেছে যে, বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক, সময় যতই দূরত্ব অতিক্রম করুক, মানুষ যেখানেই গিয়ে পৌঁছুক এবং সময় যতই পার্শ্ব পরিবর্তন করুন—বিশ্ব-মানবতা তাদের স্রষ্টার পথ-নির্দেশ (কোরআন মজীদ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তি পেতে পারে না। মানব-মুক্তির পথ কোনো বিজ্ঞান কিংবা কোনো বস্তুবাদী উন্নতির কাছে নেই—আছে শুধু কোরআনের কাছে।

যারা পবিত্র কোরআনকে কেবল একটি 'ধর্মীয় গ্রন্থ' বলে চালিয়ে দিতে চায়, তারা অন্য কাউকে নয়, শুধু নিজকে ধোকা দিচ্ছে। কোরআন মজীদ হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার গ্রন্থ এবং কোরআন ও সুন্নাহর পথ-নির্দেশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য। একে উপেক্ষা করার অর্থ জীবন-সংগ্রামে নিজকে অকৃতকার্য করা। কোরআন ছাড়া জীবন—তাতো কেবল একটি অর্থহীন সওদা।

মুসলমানদের জন্য কোরআন হচ্ছে একটি কার্যকর প্রচেষ্টার গ্রন্থ। যা তাকে এসত্যের সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দেয়, যে সত্য পর্যন্ত সে নিজে পৌঁছে। এদিক থেকে পবিত্র কোরআন ইসলামী আন্দোলনের দিশারী-গ্রন্থ। আর তাফহীম তার এ দিকটিকে কখনো দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে দেয়নি।

এই কয়টি কথা তাফহীমুল কোরআনের ব্যাপারে আলোচনা করা সত্ত্বেও আমি বলবো—তাফহীমুল কোরআন কী, এ প্রশ্নের জওয়াব একমাত্র তাফহীমুল কোরআন পড়েই পাওয়া যাবে।

কেউ যদি বলে যে, সে খুব ব্যস্ত, তবে আপনি তার একথা বিশ্বাস করেন যে, সে আসলেই ব্যস্ত। কিন্তু আপনি যখন তাকে তাফহীমুল কোরআন পড়তে দেবেন এবং সে তার কিছু অংশ পড়ে নেবে, তখন সাথে সাথেই সে অনুভব করবে যে, তাফহীম পড়ার মতো তার কাছে যথেষ্ট সময় আছে।

মূল উর্দু থেকে অনূদিত

www.nagorikpathagar.org

'মাওলানা মওদূদী ও তাফহীমুল কোরআন' বইটির সম্পাদক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ বাংলা সাহিত্যের অংগনে একজন পরিচিত ব্যক্তি।

'কোরআনের অভিধান', 'সেকেন্ড বুক অব ইসলাম', 'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর' সহ ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর তার রচিত পুস্তকের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক। তিনি মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'ইসলামিক রিলিফ এজেন্সী' (ইসরা)-এর লন্ডনের ডাইরেক্টর। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন-এ 'রোল অব উইমেন ইন মুসলিম ওয়ার্ল্ড'-এ বিষয়ের ওপর ডক্টরেট (পিএইচ ডি) করছেন।

তারই সম্পাদনায় এই প্রথম বার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে এই শতকের সংগ্রামী ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদের কালজয়ী আরবী তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'। গত দু'-তিন দশকে পৃথিবীর বহু ভাষায় এই তাফসীরটি অনূদিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে ইতিমধ্যেই এই তাফসীরের মোট ১২টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ ওসমানীর 'তাফসীরে ওসমানী'র বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজও তার উদ্যোগে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এই তাফসীরেরও তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org